এমন দিনে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ফাল্গুন,
১৮৮৩ শকাব্দ

৩·৭৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯







এমন দিনে

দিনের পর দিন কাঠ-ফাটা গরম ভোগ করিয়া মানুষ যখন আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তখন বৃষ্টি নামিল। শুধু বৃষ্টি নয়, বজ্র বিদ্যুৎ ঝোড়ো-হাওয়া। শহরের তাপদগ্ধ মানুষগুলাকে শীতলতার সুধাসমুদ্রে চুবাইয়া দিল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বেলা আন্দাজ তিনটার সময়। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ দরবিগলিত ধারায় ভিজিতে ভিজিতে বাতাসের ঝাপ্টা খাইতে খাইতে সমীর গৃহে ফিরিল। শহরের প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ী; নীচে দুটি ঘর, উপরে একটি। এইখানে সমীর তাহার বৌ ইরাকে লইয়া থাকে। দুটি প্রাণী। মাত্র বছর দেড়েক বিবাহ হইয়াছে। এখনও কপোতকূজন শেষ হয় নাই।

বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। সমীর দ্বারের পাশে ঘন্টি টিপিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ইরা দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। চকিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—'খুব ভিজেছ তো?'

সমীর ভিতরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তারপর ভিজা জামাকাপড় সুদ্ধ ইরাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। তাহার কোটপ্যান্টুলুন হইতে নির্গলিত জল ইরার দেহের সম্মুখভাগ ভিজাইয়া দিল। সমীর বলিল,—'কী মজা! আজ খিচুড়ি খাব।'

ইরার মাথাটা সমীরের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছায়। সে সর্বাঙ্গ দিয়া সমীরের দেহের সরসতা যেন নিজ দেহে টানিয়া লইল, তারপর ডিঙি মারিয়া তাহার চিবুকে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল,— 'নিজে ভিজেছ, আবার আমাকেও ভিজিয়ে দিলে। ছাড়ো এবার।

শীগ্‌গির জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলো, বাথরুমে সব রেখেছি। যা তোমার ধাত, এখুনি গলায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

সমীর বলিল,—'কী, আমার গলার নিন্দে! শোন তবে—' বলিয়া গান ধরিল,—'এমন দিনে তারে বলা যায়—'

সমীরের গলা সুরের ধার দিয়া যায় না। ইরা তাহার বুকে হাত দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল; বলিল,—'বাথরুমে গিয়ে গান গেও। কি খাবে—চা না কফি?'

সমীর তান ছাড়িল,—'চা—চা—চা! যে চা মান্য অতিথিদের জন্যে সঞ্চয় করা আছে, যার দাম সাড়ে সাত টাকা পাউণ্ড, আজ সেই চা খাব। সখি রে-এ-এ-এ'—সমীর গিয়া বাথরুমে দ্বার বন্ধ করিল।

ইরা একটু দাঁড়াইয়া ভাবিল। সেও শাড়ী ব্লাউজ ছাড়িয়া ফেলিবে? না থাক, এ জল গায়েই শুকাইয়া যাক।···

বসিবার ঘরে আলো জ্বলিয়াছে। সমীর ও ইরা সামনাসামনি বসিয়া চা খাইতেছে। চায়ের সঙ্গে ডিম-ভাজা।

বাহিরে বর্ষণ চলিয়াছে। কখনও হাওয়ার দাপট বাড়িতেছে, বৃষ্টির বেগ কমিতেছে; কখনও তাহার বিপরীত। মেঘের গর্জন প্রশমিত হইয়া এখন কেবল গলার মধ্যে গুরুগুরু রব। ক্বচিৎ বিদ্যুতের একটু তৃপ্তহাসি।

এবেলা ঝি আসে নাই। বাঁচা গেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমীরের এক বন্ধু তাহার বাসায় আসিয়া আড্ডা জমায়, সে আজ বৃষ্টিতে বাহির হয় নাই। ভালই হইয়াছে। আজ বাড়ীতে শুধু তাহারা দু'জন। এই জনাকীর্ণ নগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক; বৃষ্টি তাহাদের নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে। পরস্পরের সঙ্গ-সরস নিবিড় নিঃসঙ্গতা।

আজ সকালে অফিস যাইবার সময় সমীরের সঙ্গে ইরার একটু মনান্তর হইয়াছিল। সমীর মুখ ভার করিয়াছিল, ইরার অধর একটু স্ফুরিত হইয়াছিল। তখন দুঃসহ গরম। তারপর—পৃথিবীর বাতাবরণ বদলাইয়া গেল। কী লইয়া মনান্তর হইয়াছিল? ইরা অলসভাবে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না।

চা শেষ হইলে ইরা ট্রে সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া বসিল, সমীর সিগারেট ধরাইল। দু'জনে পরিতৃপ্ত মনে কোনও কথা না বলিয়া মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

পৃথিবীর সকল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না। যেখানে যেখানে মিল হইয়াছে সেখানেও ষোলোআনা মিল না হইতে পারে। দেহের স্তরে, হৃদয়ের স্তরে এবং বুদ্ধির স্তরে মিল কোটিকে গুটিক মিলে। সমীর ও ইরার ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে দেহ-মন ও বুদ্ধির মিল অনেকখানিই হইয়াছিল; তাহাদের দেহ-মন পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির স্বাদ পাইয়াছিল; বুদ্ধির দিক দিয়াও তাহারা পরস্পরকে সাগ্রহে বুঝিবার চেষ্টা করিত এবং অনেকটা বুঝিয়াছিলও। তবু মাঝে মাঝে কোন্ অসমতার ছিদ্রপথে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইত, দু'জনকেই ব্যাকুল করিয়া তুলিত। বোধকরি দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত একটা স্তর আছে হয়তো তাহা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের স্তর; সেখানে কেহ উঠিতে পারে না। তাই নিভৃত মনের গোপন কন্দরে একটু শূন্যতা থাকিয়া যায়।

কিন্তু আজ, বর্ষণ-পরিপ্লুত রাত্রে, সমীর ও ইরার মনে কোনও শূন্যতাবোধ ছিল না। বন্যার জলে যখন দশদিক ভাসিয়া গিয়াছে তখন কূপে কতখানি জল আছে কে তাহা মাপিয়া দেখিতে যায়।

দুইজনে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সমীর বলিল,—'অত দূরে কেন, কাছে এসে বোসো।'

ইরা বলিল,—'তুমি এস।' বলিয়া সোফা দেখাইল।

দু'জনে উঠিয়া গিয়া বেতের সোফায় পাশাপাশি বসিল। জানালার কাচের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ মুচকি হাসিল, মেঘ চাপা স্বরে গুরুগুরু করিল। সমীর বলিল—'কেমন লাগছে?'

সমীরের সিল্কের কিমোনোর কাঁধে গাল রাখিয়া ইরা অর্ধনিমীলিত নেত্রে চুপ করিয়া রহিল, শেষে অস্ফুটস্বরে বলিল,—'বলা যায় না।'

সমীর বলিল,—'কিন্তু কবি লিখেছেন বলা যায়।'

'কবি বলতে পারেন, তাই বলে কি আমরা পারি?'

'পারি।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সমীর ইরাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল,—'আজ বলব তোমাকে। তুমি বলবে?'

অনেকক্ষণ সমীরের বাহুবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া ইরা চুপিচুপি কহিল, 'বলব।'

সে-রাত্রে তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া তাহারা দ্বিতলের ঘরে শুইতে গেল।···

রাত্রি এগারোটা। বৃষ্টি মাঝে থামিয়া গিয়াছিল, আবার শুরু হইয়াছে। শিথিল বৃষ্টি, অবসন্ন মেঘের শ্লথ মুষ্টি হইতে অবশে ঝরিয়া পড়িতেছে।

সমীর ও ইরা বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছে। নীলাভ নৈশ দীপের মৃদু প্রভায় ঘরটি স্বপ্নাবিষ্ট। দু'জনে চোখ বুজিয়া জাগিয়া আছে।

ইরার একটা হাত অলস তৃপ্তিতে সমীরের গায়ে পড়িল; সে কহিল,—'এবার বল।'

সমীর হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, নৈশ দীপ নিভিয়া গেল। অন্ধকারে ইরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সমীরের সাড়া না পাইয়া ইরা আঙুল নাড়িয়া তাহার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিল। সমীর তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

হিসেব করছিলাম কতদিন আগেকার কথা। মাত্র সাত বছর, আমার বয়স তখন কুড়ি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কবেকার কথা। তখন আমি কলকাতায় থেকে থার্ড ইয়ারে পড়ি আর কলেজের হোস্টেলে থাকি।

লম্বা ছুটিতে বাড়ী যেতাম, কিন্তু ছোটখাটো দু'এক দিনের ছুটিতে বাড়ী যাওয়া হত না। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে আমার এক পিসেমশাই থাকতেন, তাঁর কাছে যেতাম। বেশী দূর নয়, শিয়ালদা থেকে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা ; আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁ জায়গাটা। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতে বেশ লাগত। গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, পিসিমার হাতের রান্না—

পিসেমশায়ের সংসারে ওঁরা দু'জন ছাড়া আর একটি মানুষ ছিল, পিসেমশায়ের ভাগ্‌নী সরলা। পিসিমাদের একমাত্র ছেলে অজয়দা নদীয়ার কলেজে প্রফেসারি করতেন, বাড়ীতে বড় একটা আসতেন না। এঁদের সংসার ছিল এই তিনজনকে নিয়ে।

সরলা বাপ-মা-মরা মেয়ে, মামার কাছে মানুষ হয়েছিল। বয়সে আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট ; বিয়ে হয়নি। রোগা লম্বা চেহারা, ফ্যাল্‌ফেলে দু'টো চোখ, মেটে-মেটে রঙ। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে মন্দ নয়। একটু যেন ভীরু প্রকৃতি, সহজভাবে কারুর সঙ্গে মিশতে পারত না। প্রথম প্রথম আমাকে দেখে পালিয়ে বেড়াত। তারপর 'সমীরদা' বলে ডাকত, কিন্তু চোখে চোখ মিলিয়ে চাইতে পারত না।

আমার তখন যে বয়স সে-বয়সে সব মেয়েকেই ভাল লাগে। সরলাকেও আমার ভাল লাগত। কিন্তু মনে পাপ ছিল না। তাছাড়া আমি কি রকম আনাড়ি ছিলাম তা তো তুমি জানো। মেয়েদের যতই ভাল লাগুক, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার কায়দা-কানুন জানতাম না।

যাহোক, একদিন পিসিমার বাড়ীতে গিয়েছি। সেটা ফাগুন কি চৈত্র মাস ঠিক মনে নেই। বিকেলবেলা পৌঁছে দেখি বাড়ীতে হৈ-হৈ কাণ্ড। নবদ্বীপ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে অজয়দার ভারি অসুখ; পিসেমশাই আর পিসিমা এখনি নবদ্বীপ যাচ্ছেন। আমাকে দেখে পিসিমা বললেন—তুই এসেছিস বাবা, ভালই হল। অজুর অসুখ, আমরা এখুনি নবদ্বীপ যাচ্ছি। ঠাকুরের দয়ায় যদি অজু ভাল থাকে, তোর পিসেমশাই কালই ফিরে আসবেন। তুই ততক্ষণ বাড়ী আগ্‌লাস্। সরলাও রইল।

পিসিমা আর পিসেমশাই প্রায় একবস্ত্রে ইস্টিশানে চলে গেলেন। বাড়ীতে রয়ে গেলাম আমি আর সরলা।

ক্রমে সন্ধ্যে হল, সন্ধ্যে থেকে রাত্রি। আমার মনে যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সরলা রান্না করতে গেল। খাবার তৈরি হলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। সরলার সঙ্গে আমার তিনটে কথা হল কিনা সন্দেহ। সে আমার পানে কেমন একরকমভাবে তাকাচ্ছে, আবার তখনি চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। তার চাউনির মানে ধরতে পারছি না, কিন্তু মনটা অশান্ত হয়ে উঠছে। এক বাড়ীতে আমি আর একটি যুবতী, আর কেউ নেই। আগুন আর ঘি—

রাত বাড়তে লাগল। আমি বাড়ীর দোড়তাড়া বন্ধ করে শুতে গেলাম। আমার শোবার ঘর নীচে, বৈঠকখানার পাশে; সরলা শোয় ওপরে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। খাটটা বেশ বড় ; হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যায়। জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। আমার মনটা বেশ শান্ত হয়ে এল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একজনের গায়ে হাত ঠেকে। চোখ চেয়ে দেখি সরলা আমার পাশে বিছানায় শুয়ে আছে।···তারপর—তারপর সে-রাত্রির বর্ণনা দিতে পারব না। সারারাত্রি নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কাঠ হয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। সরলাও বোধহয় সারারাত জেগে ছিল ; ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিনটা কাটল দুঃস্বপ্নের মতো। একসঙ্গে ওঠা-বসা, সে রাঁধছে আমি খাচ্ছি, অথচ কেউ কারুর মুখের পানে তাকাতে পারছি না। আজ যদি পিসেমশাই ফিরে না আসেন, যদি রাত্রে আবার কালকের মতো ব্যাপার ঘটে, তাহলে—

সরলার মনে কি ছিল জানি না। হয়তো সে ভূতের ভয়েই আমার কাছে এসে শুয়েছিল। কিন্তু আমি নিজের কথা বলতে পারি, ভূতের চেয়েও বড় ভূত আমার কাঁধে ভর করেছিল। সেদিন যদি পিসেমশাই না আসতেন—

ভাগ্যক্রমে পিসেমশাই বিকেলবেলা ফিরে এলেন। অজয়দা'র পান-বসন্ত হয়েছে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি সেই রাত্রেই কলকাতায় চলে এলাম। তারপর সরলাকে আর দেখিনি ; ওদিকেই আর পা বাড়াইনি। তবে শুনেছি সরলার বিয়ে হয়ে গেছে।

সমীর নীরব হইল। ইরাও কথা কহিল না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সমীর জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন শুনলে ?'

ইরা সমীরের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল,—'আনাড়ি ছিলে বলেই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু ভারি রোমান্টিক আর রহস্যময়।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটু তরলতার আভাষ পাওয়া গেল।

সমীর প্রশ্ন করিল,—'আর তোমার?'

'আমার ভারি সীরিয়স ব্যাপার হয়েছিল।'

ইরা ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

আমার তখন সতরো বছর বয়স, বছর চারেক আগেকার কথা। সবে স্কুল থেকে কলেজে ঢুকেছি।

আমার প্রাণের বন্ধু সাধনা একবছর আগে কলেজে ঢুকেছে একদিন চুপিচুপি আমায় বলল, সে প্রেমে পড়েছে। এক গল্প-লেখকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলছে। আমাকে চিঠি দেখাল।

দেখেশুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। আমি যেন সব-তাতেই পেছিয়ে আছি। কী উপায়? আমার বাপের বাড়ীতে মেয়েদের ওপর ভারি কড়া নজর। মেয়ে-কলেজে পড়ি, গাড়ি চড়ে গুড়গুড় করে কলেজে যাই, গুড়গুড় করে ফিরে আসি। ছোঁড়াদের সঙ্গে হুল্লোড় করার সুবিধে নেই। বাবা জানতে পারলে কেটে ফেলবেন।

সাধনার কথাবার্তা থেকে মনে হয় প্রেমে না পড়লে জীবনই বৃথা। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে প্রেমে পড়ে গেলুম। আমাদের কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর দিগম্বরবাবুর সঙ্গে।

তুমি যা ভাবছ তা নয়; দিগম্বরবাবুর নামটাই বুড়ো, তিনি মানুষটা বুড়ো নয়। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, পাতলা ধারালো মুখ, খাঁড়ার মতো নাকের ওপর রিম্‌লেস চশমা। তাঁর কথা-বলার

ভঙ্গীতে এমন একটা চাপা বিদ্রূপ থাকত যে মেয়েরা মনে মনে তাঁকে ভয় করত, তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ার সাহস কারুর ছিল না। আমিই বোধহয় প্রথম।

প্রফেসারদের মধ্যে দিগম্বরবাবুই ছিলেন অবিবাহিত। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমার বাবার বয়সী; কারুর তিনটে ছেলে, কারুর পাঁচটা মেয়ে।

দিগম্বরবাবু যখন ক্লাসে আসতেন আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকতাম। তাঁর নাকের ফুটো ছিল ভীষণ বড় বড়, কানে খাড়া খাড়া লোম, মাথার ঠিক মাঝখানে ঘষা পয়সার মতো খানিকটা জায়গায় চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল, মাথা হেঁট করলেই চক্‌চক্ করে উঠত। বোধহয় টাকের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু তিনি পড়াতেন ভারি চমৎকার, শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে যেতুম।

কিছুদিন এইভাবে দূর থেকে প্রেম-নিবেদন চলল। কিন্তু এভাবে কতদিন চলে? সাধনা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে—প্রেম কতদূর? আমি কিছুই বলতে পারি না। সাধনার প্রেম অনেকদূর এগিয়েছে; তারা এখন লুকিয়ে লুকিয়ে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়, পার্কে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রেমালাপ করে। এদিকে আমার প্রেম যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, এক পা এগুচ্ছে না। এগুবে কোত্থেকে? দিগম্বরবাবুর কাছে গিয়ে কথা কইবার নামেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

শেষে এক চিঠি লিখলুম। হৃদয়ের আবেগ-ভরা লম্বা চিঠি। তারপর কলেজের ঠিকানায় প্রফেসর দিগম্বর ঘোষালের নামে পাঠিয়ে দিলুম। চিঠিতে সবই ছিল, কেবল একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। নিজের নাম দস্তখত করিনি।

পরদিন বিকেলবেলা হিস্ট্রির ক্লাস। দিগম্বরবাবু ক্লাসে এলেন।

লেক্‌চার আরম্ভ করবার আগে পকেট থেকে আমার চিঠিখানা বার করে বললেন,—'আমি আজ একটা প্রেমপত্র পেয়েছি, তোমাদের পড়ে শোনাতে চাই।'

দিগম্বরবাবু চিঠি পড়তে লাগলেন। মেয়েরা প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারপর মুখ-তাকাতাকি করতে লাগল। দিগম্বরবাবুও চিঠি পড়তে পড়তে চোখ তুলে আমাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। মনে হল আমার বুকের দুমদুম শব্দ সবাই শুনতে পাচ্ছে। কেন যে তখনই ধরা পড়ে যাইনি তা জানি না। দিগম্বরবাবু কিন্তু চিঠির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলেন না, চিঠি শেষ করে একটু মুচকি হেসে লেক্‌চার আরম্ভ করলেন।

কলেজে এই নিয়ে বেশ একটু হৈ-চৈ হল। দিগম্বরবাবু অন্য ক্লাসের মেয়েদেরও চিঠি পড়ে শুনিয়েছেন। সব মেয়েরা উত্তেজিত, কে চিঠি লিখেছে? ভাগ্যিস, চিঠিতে সই করতে ভুলে গিয়েছিলুম, নইলে বিষ খেতে হত।

আমার প্রেম তখন মুমূর্ষু, পুরুষ জাতটা যে কী ভীষণ হৃদয়হীন তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সাধনা আমাকে বোঝাচ্ছেন যে, প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, ওতে ভয় পেলে চলবে না। আমি কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। বাবা যদি জানতে পারেন—

দশ-বারো দিন কেটে গেল, তারপর এক নতুন খবর কলেজে ছড়িয়ে পড়ল—দিগম্বরবাবু স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন। আমার খুবই দুঃখ হবার কথা, কিন্তু দুঃখ মোটেই হল না। ভাবলুম এবার বুঝি প্রেমের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কিন্তু নিষ্কৃতি অত সহজ নয়। বিলেত যাবার আগের দিন

দিগম্বরবাবু আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠালেন। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর অফিস-ঘরে গেলুম। তিনি টেবিলের সামনে বসে কাগজপত্র সই করছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না। আমাকে দেখে ঘাড় নেড়ে বললেন,—'বোসো'।

আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসলুম। তিনি কাগজে সই করতে করতে বললেন,—'চিঠিখানা তুমি লিখেছিলে?'

আমি কেঁদে ফেললুম।

তিনি উঠে এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন; নরম সুরে বললেন,—'তুমি সত্যি আমায় ভালবাস?'

অত বড় উচ্ছ্বাসময় চিঠির পর আর অস্বীকার করা চলে না। আমি ঘাড় নেড়ে জানলুম,—'হ্যাঁ, ভালবাসি।'

তিনি তখন বললেন,—'কিন্তু আমি যে কালই বিলেত চলে যাচ্ছি, বছরখানেক সেখানে থাকতে হবে। তুমি একবছর অপেক্ষা করতে পারবে?'

আমি ঘাড় নাড়লুম—'হ্যাঁ, পারব।'

তিনি হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন; বললেন,—'বেশ বেশ। এখন যাও, মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। আমি ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

দিগম্বরবাবু বিলেত চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আনন্দে কাটল। তারপর ক্রমে দুর্ভাবনা। যতই দিন ফুরিয়ে আসছে ততই ভয় বাড়ছে। এইভাবে একবছর যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন দিগম্বরবাবুর এক চিঠি পেলুম। বোধহয় কলেজ থেকে আমার ঠিকানা যোগাড় করেছিলেন। এই তাঁর প্রথম এবং শেষ চিঠি। তিনি লিখেছেন—'কল্যাণীয়াসু, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরব। তুমি শুনে সুখী হবে, আমি এখানে এসে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে

করেছি। তার নাম নেলি। মিষ্টি নাম নয়? আশা করি, তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করছ। ইতি—'

কি আনন্দ যে হয়েছিল তা আর বলতে পারি না। তারপর আর কি? আর প্রেমে পড়িনি। দু'বছর পরে তোমার সঙ্গে বিয়ে হল।

সমীর হাত বাড়াইয়া নৈশ দীপ জ্বালিল। দুইজনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি শুইয়া রহিল। তারপর অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সমীর বলিল,—'দিগম্বরবাবু ভদ্রলোক ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু ইরা, সত্যি যদি একটা নোংরা ব্যাপার হত? তুমি আমাকে বলতে পারতে?'

ইরা কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। আজ মনকে চোখ ঠারিবার দিন নয়; সে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল। না, আজিকার রাত্রে সে সমীরের কাছে কোনও কথাই লুকাইতে পারিত না। সে চোখ খুলিয়া বলিল,—'পারতাম।'

আবার বৃষ্টির জোর বাড়িয়াছে। জানালার বাহিরে একটানা ঝরঝর শব্দ। দুইজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে শুইয়া ভাবিতেছে। আজ তাহারা যেমন পরিপূর্ণভাবে পরস্পরকে পাইয়াছে এমন আর পূর্বে কখনও পায় নাই; তাহাদের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক ছিল তাহা নিবিড়ভাবে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

সাক্ষী

জেলা-কোর্টের দায়রা এজলাসে খুনের মামলা শেষ হইয়াছে। আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছে। আমরা যে-কয়জন কলিকাতার সাংবাদিক লোমহর্ষণ পরিস্থিতির খবর পাইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অন্য সকলেই ফিরিয়া গিয়াছে, কেবল আমি রহিয়া গিয়াছি। মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং আসামী সুবিচার পাইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই; তবু আমার মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কোথায় যেন একটি গুরুতর প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

শহরের ধনী এবং উচ্ছৃঙ্খল যুবক মোহিতমোহন রক্ষিত নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেরারী হয়, তারপর ধরা পড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য ছিল না, কেহ মোহিতকে খুন করিতে দেখে নাই; কিন্তু জোরালো circumstantial evidence ছিল। মোহিতের স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছিল কটুভাষিণী খাণ্ডার মেয়ে; মোহিতের সহিত প্রায়ই তাহার ঝগড়া হইত। এমন কি মাঝে মাঝে মারপিটও যে হইত, পাড়াপড়শী তাহার সাক্ষী ছিল। মোহিত দায়রা-সোপর্দ হইল।

মামলা যখন সঙীন হইয়া উঠিয়াছে, মোহিতের প্রাণরক্ষার কোনও রাস্তাই নাই, এমন সময় কালীময় ঘোষ নামক এক স্থানীয় ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় কোর্টের পক্ষ হইতে সাক্ষী দিলেন। তিনি বলিলেন, যে-রাত্রে এগারোটার সময় অন্নপূর্ণা খুন হয় সে-রাত্রে সওয়া দশটা হইতে প্রায় বারোটা পর্যন্ত মোহিত কালীময়ের গৃহে ছিল, মোহিত তাঁহার স্ত্রীর উপপতি। সওয়াল জবাবের পর সন্দেহ

থাকে না যে কালীময় ঘোষ সত্য কথা বলিতেছেন। তাঁহার সাক্ষ্যের জোরে মোহিত মুক্তি পায়।

মফঃস্বলের মামলায় কলিকাতা হইতে সাংবাদিকেরা বড় একটা আসে না, স্থানীয় সংবাদদাতারাই খবর পাঠায়। এই মামলার শেষের দিকে আমরা টেলিফোনে খবর পাইয়া আসিয়া জুটিলাম। কাগজে খুব হৈ-হৈ হইল। তারপর মামলার নিষ্পত্তি হইলে সকলে ফিরিয়া গেল। আমি কেবল রহিয়া গেলাম।

পরদিন বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি কালীময় ঘোষের বাড়ীতে গেলাম। পাড়াটা নিরিবিলি, কয়েকঘর ভদ্র গৃহস্থের বাস। বাগান-ঘেরা একতলা ছোট ছোট বাড়ীগুলি, সবগুলিই প্রায় এক ছাঁচের। কেবল একটা বাড়ী দ্বিতলের গর্বে মাথা উঁচু করিয়া আছে। সেটি মোহিত রক্ষিতের বাড়ী। কালীময়বাবুর বাড়ী হইতে মোহিত রক্ষিতের বাড়ীটা ষাট-সত্তর গজ দূরে। আমরা এখানে আসিয়া প্রথমেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছিলাম, স্থানটার প্ল্যান জানাছিল।

কালীময় ঘোষের ছোট্ট বাগান পার হইয়া বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটা নির্জন মনে হইল। একা কালীময়বাবু সম্মুখের বারান্দায় মাতুরে বসিয়া বঁড়শিতে সূতা বাঁধিতেছেন। চারিদিকে মাছ-ধরার সরঞ্জাম, হুইলযুক্ত দুইটা ছিপ, মুগার সূতা, ময়ূরপুচ্ছের ফাৎনা ইত্যাদি।

কালীময়বাবুর বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। দোহারা বলিষ্ঠ গোছের চেহারা, মাথার চুল ও গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা। খাটো ধুতির উপর ময়লা সোয়েটার পরিয়া তিনি বসিয়া আছেন; যে বয়সে মানুষ নিজের দৈহিক পারিপাট্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে সেই বয়স। আমাকে দেখিয়া হাঁটুর উপর একটু কাপড় টানিয়া দিয়া ভ্রূ তুলিলেন,—'আপনি?'

কালীময়বাবুকে আমি ইতিপূর্বে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দেখিয়াছি। তাঁহার বাহ্য আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে বেশ স্পষ্ট ধারণা আছে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করা সহজ নয়। লোকটি ভদ্রশ্রেণীর, জাতিতে কায়স্থ, অভাবগ্রস্ত নয়, সচ্ছল অবস্থার মানুষ; অশিক্ষিত নয়, বি-এ বি-এল; তবু তাঁহার কথায় ও আচার ব্যবহারে কোথায় যেন একটু চাষাড়ে ভাব আছে। চাষাড়ে কথাটা হয়তো ঠিক হইল না, শহুরে পালিশের অভাব বলিলে ভাল হয়। পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহাকে বেমানান মনে হইবে না, কিন্তু কলিকাতার মার্জিত সমাজের কোনও ড্রয়িংরুমে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি হংসমধ্যে বকের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম, তারপর তাঁহার কাছে গিয়া মাদুরের প্রান্তে বসিলাম। তিনি একবার রুক্ষ চোখে আমার পানে চাহিলেন; বলিলেন,—'সব তো চুকে-বুকে গেছে। আবার কেন?'

আমি বলিলাম,—'না না, আমি সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাছে আসিনি। নিতান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহল; আপনার মতো চরিত্রবল আজকালকার দিনে দেখা যায় না। একটা দুশ্চরিত্র লম্পটের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনি—'

তোয়াজে কাজ হইল না, তিনি দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়া বলিলেন,—'ওসব কথা ছাড়ান দিন। কি জানতে চান?'

সঙ্কুচিত প্রশ্ন করিলাম,—'আপনার স্ত্রী—?'

'সে পালিয়েছে'—কালীময়বাবু আবার বঁড়শি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

'সেকি! কোথায়? কার সঙ্গে?'

'জানি না। খোঁজ করিনি।'

কিছুক্ষণ নীরবে তাঁহার বঁড়শি-বাঁধা দেখিলাম। একটি মুগার সূতায় দু'টি বঁড়শি বাঁধিতেছেন। বর্ধমানের ভাল বঁড়শি। বঁড়শি বাঁধিবার বিশেষ কায়দা আছে, যেমন তেমন করিয়া বাঁধা চলে না। প্রথমে একটি বঁড়শিকে সূতার এক ধারে বাঁধিয়া দুই পাশের সূতা পাকাইয়া এক করিতে হয়। তারপর অন্য বঁড়শি সূতার অন্য প্রান্তে অনুরূপ প্রথায় বাঁধিতে হয়। দুইটি বঁড়শি পাশাপাশি ঝুলিতে থাকে।

'আপনি ছিপে মাছ ধরতে ভালবাসেন ?'

'হ্যাঁ।'

'রাত্রে মাছ ধরেন কেন ?'

'মজা আছে। দিনে মাছ-ধরার চেয়ে ঢের বেশী মজা। কারবাইডের সাইকেল-ল্যাম্প জ্বেলে জলের ওপর আলো ফেললে মাছ আসে।'

'আজ রাত্রে মাছ ধরতে যাবেন নাকি ?'

'না, আজ আর হবে না।'

'আপনার বাড়ীতে এখন কে কে আছে ?'

'কেউ নেই, আমি একা। নিজে রেঁধে খাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ বঁড়শি-বাঁধা দেখিয়া বলিলাম,—'আচ্ছা, মোহিত রক্ষিত তার স্ত্রীকে খুন করেনি তা যেন প্রমাণ হল, কিন্তু কে খুন করেছিল তা তো জানা গেল না।'

কালীময় আমার পানে একটি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'আপনি আইনের কিছু জানেন না দেখছি। কে খুন করেছে এ-মামলায় তা জানবার দরকার নেই, মোহিত রক্ষিত খুন করেনি প্রমাণ হলেই যথেষ্ট।'

'তবু, কে খুন করেছে জানা দরকার তো।'

'সে ভাবনা পুলিসের।'

'তা বটে। তবু—'

বঁড়শি-বাঁধা শেষ হইলে কালীময় সুতা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেন অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—'আপনি মদ খান?'

'মদ!'

'হ্যাঁ—মদ। হুইস্কি ব্রাণ্ডি জিন। খান?'

সত্যকথা বলিলাম,—'পরের পয়সায় পেলে খাই।'

'তবে আসুন।'

কালীময় আমাকে বাড়ীর ভিতর বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

কালীময়ের মনের মধ্যে অনেক কথা জমা হইয়া ছিল। সে-রাত্রে আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসিয়া একটি বোতল হুইস্কি সাবাড় করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে তাঁহার মুখে যে বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম তাহার সহিত আদালতে প্রদত্ত এজেহার মিলাইয়া একটা গোটা কাহিনী খাড়া করা যাইতে পারে। তাঁহার পলাতকা স্ত্রী দামিনীর একটি ফটোও দেখিয়াছিলাম। এমন কিছু আহা-মরি চেহারা নয়, কিন্তু বয়স কুড়ি-বাইশ; শরীরের বাঁধুনি আছে এবং চোখে আছে কপট ভালমানুষী।

কালীময় এই জেলারই লোক। ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে ছিলেন, তারপর শহরে আসিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন, উকিল হইয়াছেন; গ্রামের জমিজমা বিক্রয় করিয়া শহরে বাড়ী কিনিয়া বাস করিতেছেন। ওকালতিতে তাঁহার পসার বেশি নয়; জরীপের কাজ করিয়া অল্পস্বল্প রোজগার হয়। হাতে কিছু নগদ টাকা আছে, লগ্নি কারবারেও মন্দ উপার্জন হয় না। মোটের উপর সচ্ছল অবস্থা।

প্রায় বিশ বছর শহরে আছেন। শহরের সকলের সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু বেশী ঘনিষ্ঠতা কাহারও সঙ্গে নাই। যে-ব্যক্তি একাধারে উকিল এবং মহাজন, তাহার সঙ্গে কাহারও বেশী ঘনিষ্ঠতা বোধহয় সম্ভব নয়।

কালীময়ের প্রথমপক্ষের স্ত্রী রুগ্না ছিলেন, বিবাহিত জীবনের প্রায় পনরোটা বছর নিরবচ্ছিন্ন শয্যাগত থাকিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। কালীময়ের বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে; পুনর্বার বিবাহ করিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, পুন্নাম-নরকের ভয়ও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কালীময়ের এক দূর-সম্পর্কের বোন ছিল, তাহার বিবাহ হইয়াছিল অন্য জেলায়; কালীময় বিপত্নীক হইয়াছেন শুনিয়া সে আসিয়া দাদাকে ধরিয়া বসিল—তাহার স্বামীর এক দূর-সম্পর্কের ভগিনী আছে, মেয়েটি অনাথা, তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। রূপবতী গুণবতী কন্যা, নেহাত অনাথা বলিয়াই দূর-সম্পর্কের ভায়ের গলায় পড়িয়াছে।

শেষ পর্যন্ত কালীময় দামিনীকে বিবাহ করিলেন। দামিনী সাধারণ বিচারে দেখিতে-শুনিতে ভালই, রূপ যত না থাক, চটক আছে। গুণের পরিচয় ক্রমে প্রকাশ পাইল। সংসারের কাজ জানিলেও সেদিকে স্পৃহা নাই। ভালমানুষের মতো ঘরে থাকে বটে, কিন্তু মন বাহিরের দিকে। ঘরের কাজ ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়িতে ভালবাসে, সাজ-গোজের দিকে নজর বেশি, সিনেমা দেখার দিকে প্রচণ্ড লোভ।

প্রথমে কালীময় কিছু দেখিতে পান নাই। ক্রমে নব-পরিচয়ের ঘোলা জল পরিষ্কার হইতে লাগিল। কিন্তু নূতন বৌয়ের যে দোষগুলি তিনি দেখিতে পাইলেন সেগুলি তাঁহার মারাত্মক মনে হইল না। দামিনী সাধারণ মেয়ে, এইরূপ সাধারণ মেয়ের সাধারণ

দোষগুণ লইয়া সংসারসুদ্ধ লোক ঘর করিতেছে। কালীময় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন না।

বছরখানেক কাটিয়া গেল। কালীময় ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিলেন, দামিনী সাধারণ মেয়ে নয়। সে অত্যন্ত স্বার্থপর, অন্যের সুখ-সুবিধা সামর্থ্যের কথা সে ভাবে না। তাহার একটা প্রচ্ছন্ন জীবন আছে; তাহার অতীত-জীবনে কোনও গুপ্ত-রহস্য আছে। সে অত্যন্ত সরল নিরীহ মুখ লইয়া অনর্গল মিথ্যা কথা বলে। সে লুকাইয়া লুকাইয়া কাহাকে চিঠি লেখে।

একদিন একটা সামান্য ঘটনা ঘটিল। কালীময়ের বাড়ীর ঠিক সামনে রাস্তার ধারে একটা ডাক-বাক্স আছে; দুপুরবেলা কালীময় একটা দলিল লইবার জন্য কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথঘাট শূন্য, মোড় ঘুরিয়া নিজের রাস্তায় পড়িয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, দামিনী টুক্ করিয়া ফটকের বাহিরে আসিয়া একখানা খামের চিঠি ডাকে ফেলিয়া আবার সুট্ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

কালীময় গৃহে প্রবেশ করিয়া দামিনীকে বলিলেন,—'আজ দুপুরে ঘুমোওনি দেখছি। কাকে চিঠি লিখলে?'

সরল বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দামিনী বলিল,—'চিঠি! কৈ, আমি লিখিনি তো!'

কালীময়ের ধোঁকা লাগিল। তবে কি তিনিই ভুল দেখিয়াছেন! তিনি আর কিছু বলিলেন না, দলিল লইয়া আদালতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার মনটা অনিশ্চয়ের সংশয়ে প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল।

দুই তিন দিন পরে কালীময়ের দূর-সম্পর্কের সেই ভগিনীপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যাঁহার গৃহে দামিনী থাকিত ইনি তিনিই। বয়সে কালীময়ের চেয়ে ছোট, শক্ত-সমর্থ চেহারা, চোখে শিকারী

বিড়ালের সতর্কতা। বলিলেন,—'কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

তিনি কালীময়ের গৃহেই রহিলেন ; কালীময় তাঁহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। দুই দিন ও এক রাত্রি কালীময়ের গৃহে কাটাইয়া অতিথি বিদায় লইলেন। কিন্তু তিনি কী কাজে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক বোঝা গেল না, কারণ এখানে আসিয়া তিনি একবারও গৃহের বাহির হন নাই। কালীময় অবশ্য যথারীতি দুপুরবেলা কোর্টে গিয়াছেন।

অতঃপর তিনি মাঝে মাঝে আসেন, দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যান। কালীময় সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক নন, কিন্তু তাঁর মনেও খট্‌কা লাগে। লোকটি সম্পর্কে দামিনীর ভাই, অথচ তাহাদের সম্পর্কটা ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। কালীময়ের সম্মুখে তাহারা এমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কেন? কোথায় যেন কিছু গলদ আছে।

যাহোক, এইভাবে আরও বছরখানেক কাটিয়া গেল। কালীময় দিনের বেলা কোর্টে যান, সন্ধ্যার পর একটু হুইস্কি পান করেন। এ অভ্যাস তাঁহার আগে ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। তাঁহার ভারি মাছ-ধরার শখ, আগে হপ্তায় অন্তত একবার চৌধুরীদের পুকুরে রাত্রিকালে মাছ ধরিতে যাইতেন, এখন আর অত বেশি যাওয়া হয় না ; তবুও মাঝে মাঝে যান। জরীপের কাজ পড়িলে দুই তিন দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হয়। তখন দামিনী বাড়ীতে একলা থাকে। একলা থাকিতে তাহার ভয় নাই।

কালীময়ের বাড়ীতে বেশী লোকের আসা-যাওয়া নাই, যাহারা আসে, কাজের দায়ে আসে ; কদাচিৎ দু'একজন মক্কেল, কখনও খাতক টাকা ধার লইতে বা শোধ দিতে আসে। পড়শীদের সঙ্গে

কালীময়ের নামমাত্র পরিচয়, কেবল মোহিত রক্ষিতের সহিত একটু ব্যবহারিক ঘনিষ্ঠতা আছে।

মোহিত রক্ষিত ফুর্তিবাজ ছোকরা। সুদর্শন চেহারা, মিষ্ট আচার ব্যবহার ; কিন্তু প্রচণ্ড জুয়াড়ী। বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া মাঝে মাঝে মাদকদ্রব্য সেবন করে, কিন্তু নেশাখোর নয়। প্রকাশ্যে চরিত্রদোষ ছিল না, কারণ ঘরে ছিল খাণ্ডার বৌ। এই মোহিত রক্ষিত মাঝে-মধ্যে আসিত কালীময়ের কাছে টাকা ধার লইতে। তাহার পিতা তাহার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নগদ টাকা এমন ভাবে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসে একটা বাঁধা বরাদ্দের বেশী সে হাতে পাইত না। তাই মাসের শেষের দিকে হঠাৎ টাকার ঘাটতি হইলে মোহিত কালীময়ের নিকট রিস্ট-ওয়াচ বা আংটি বাঁধা রাখিয়া, কখনও বা শুধু হাতেই, টাকা ধার লইত। আবার হাতে টাকা আসিলেই ঋণ শোধ করিয়া দিত। কালীময় মোহিতকে মনে মনে পছন্দ করিতেন, কারণ সে জুয়াড়ী হইলেও মহাজনকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত না।

একবার কালীময় জরীপের কাজে দু' তিন দিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দামিনীকে দেখিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে সন্দেহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দামিনী ভাল মেয়ে নয়, নষ্ট মেয়ে। তাহার গুপ্ত নাগর আছে। সে লুকাইয়া ব্যভিচার করে।

সন্দেহ বস্তুটা যে সকল আণুবীক্ষণিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে সে-প্রমাণ কাহাকেও দেখানো যায় না, এমন কি নিজের কাছেও তাহারা খুব স্পষ্ট নয়। তবুও এজাতীয় সন্দেহের হাত ছাড়ানো যায় না। কালীময় মাথার মধ্যে তূষের আগুন জ্বালিয়া ভাবিতে লাগিলেন—দামিনী বিবাহের আগে হইতেই দুশ্চরিত্রা···এইজন্যই

তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়াছিল ...ভগিনীপতির সঙ্গে নটঘট...লোকটা ঐজন্যই আসে...তাহারা সম্পর্কে ভাই-বোন, কিন্তু যাহারা নষ্ট-দুশ্চরিত্র তাহাদের কি সম্পর্ক-জ্ঞান থাকে ?...শুধু তাই নয়, এখানেও দামিনীর গুপ্ত-প্রণয়ী আছে ...কে সে? বাড়িতে তো সে-রকম কেহ আসে না...তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে কাহার যাতায়াত আছে ? কে সে ?

কালীময় স্থির করিলেন, কেবল সন্দেহের তুষানলে দগ্ধ হইয়া লাভ নাই, ধরিতে হইবে। হাতে-নাতে ধরিয়া তারপর নষ্ট স্ত্রীলোকটাকে দূর করিয়া দিবেন। কেলেঙ্কারি হইবে, শহরে কান পাতা যাইবে না—তা হোক।

শনিবার বিকালে আদালত হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতে করিতে কালীময় বলিলেন,—'আজ রাত্তিরে মাছ ধরতে যাব।' তাঁহার বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া মনের কথা অনুমান করা যায় না।

দামিনীর চোখের মধ্যে ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ চোখের উপর পল্লবের আবরণ নামাইয়া বলিল,—'ও।--তাহলে তোমার রাত্তিরের খাবার তৈরি করি। ফিরতে কি রাত হবে?'

কালীময় বলিলেন,—'যেমন হয়, একটা-দেড়টা।'

রাত্রি সাড়ে আটটার পর কালীময় বাহির হইলেন। একটি চটের থলিতে মাছ-ধরার সরঞ্জাম; চার, টোপ, ভাজা খোল ও মেথির গুঁড়া, একটি কারবাইডের সাইকেল-ল্যাম্প। সেই সঙ্গে একটি দেড় ফুট লম্বা লোহার ডাণ্ডা। রাত্রে মাছ ধরিতে গেলে এই ডাণ্ডাটি তাঁহার সঙ্গে থাকে। নির্জন স্থানে একাকী রাত্রি-যাপন, আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকা ভাল।

এক হাতে ছিপ, অন্য হাতে থলি লইয়া কালীময় বাহির

হইলেন। তিনি ফটক পার না হওয়া পর্যন্ত দামিনী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বাড়ীতে আর কেহ নাই; ঠিকা ঝি দিনের বেলা কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার কাল সকালে আসিয়া রাত্রির এঁটো বাসন মাজিবে।

কালীময়ের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটির দুইটি মুখ; একটি বাজারের দিকে, অন্যটি শহরের বাহিরে গিয়াছে। কালীময় বাহিরের রাস্তা ধরিলেন। চৌধুরীদের বাগানবাড়ীটা শহরের দুই মাইল বাহিরে। প্রকাণ্ড পুকুর, পুকুরে খল্‌সে পুঁটি হইতে বড় বড় রুই কাৎলা মৃগেল চিতল সব মাছই আছে। চৌধুরীরা কালেভদ্রে বাগানবাড়ীতে আমোদ করিতে যান; একটা মালী বাগান-বাড়ীর তত্ত্বাবধান করে। চৌধুরীরা বড় জমিদার; কালীময় তাঁহাদের এস্টেটের একজন উকিল। পুকুরে মাছ ধরিবার ঢালাও হুকুম আছে।

কিছুদূর চলিবার পর মোহিত রক্ষিতের বাড়ীর কাছাকাছি মোহিতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সে বলিল—এই 'যে ঘোষ মশাই! আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

কালীময় দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'কি ব্যাপার?'

'কিছু টাকার দরকার পড়েছিল।'

'কত?'

'শ' দুই।'

'তা এখন তো হবে না, কাল সকালে এস।'

'তাই যাব। কোথায় চলেছেন? চৌধুরীদের পুকুরে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ আছেন!' একটু হাসিয়া মোহিত চলিয়া গেল। নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল না শহরে কোনও জুয়ার আড্ডায় গেল।

মোহিতের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কালীময় শুনিতে পাইলেন বাড়ীর ভিতর হইতে কাংস্যকণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বর আসিতেছে—'…বাড়ীতে মন বসে না, দিনরাত শুধু জুয়া আর জুয়া! লক্ষ্মীছাড়ার দশা!…বাপ যা রেখে গেছে সব ছারে গোল্লায় দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি হবে…'

চলিতে চলিতে কালীময় ভাবিতে লাগিলেন—মোহিতের বৌ সুন্দরী এবং যুবতী; কিন্তু কী গলা! কী মেজাজ! দুনিয়ায় বিবাহ করিয়া কেহ সুখী হইয়াছে কি? তিনি নিজে দুইবার বিবাহ করিয়াছেন; প্রথমটি চিররুগ্না, দ্বিতীয়টি ভ্রষ্টা। মানুষ বিবাহ করে কেন?

রাস্তাটা আরও আধ মাইল গিয়া মিউনিসিপাল এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে, অতঃপর আর আলোকস্তম্ভ নাই। এইখানে পৌঁছিয়া কালীময় একটি গাছের তলায় উপস্থিত হইলেন। রাত্রি-কালে এ রাস্তায় লোকচলাচল খুবই কম, তবু কালীময় গাছের পিছনদিকে গিয়া ছিপটি গাছের গুঁড়িতে হেলাইয়া দিলেন; থলিটি মাটিতে রাখিয়া নিজে একটি উন্নত শিকড়ের উপর উপবেশন করিলেন। এখানে বসিলে রাস্তা দিয়া মোটর-গাড়ি যাইলেও তাহার হেড-লাইটের আলোয় তাঁহাকে দেখা যাইবে না।

পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া কালিময় ধরাইলেন; ধরাইবার সময় দেশলাইয়ের আলোতে হাতঘড়িটা দেখিয়া লইলেন। ন'টা বাজিয়া পাঁচ মিনিট।

আজ সিগারেট বড় শীঘ্র শেষ হইয়া গেল। তিনি আর একটা সিগারেট ধরাইলেন। সেটা শেষ হইলে আর একটা…

দশটা বাজিলে কালীময় পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিলেন; জুতা-জোড়া গাছের স্কন্ধে তুলিয়া রাখিলেন, শিয়াল-কুকুরে লইয়া না

যায়। তারপর থলি হইতে লোহার ডাণ্ডাটি লইয়া থলিও গাছের একটি গোঁজের মতো ডালে ঝুলাইয়া দিলেন। ছিপটি যেমন ছিল তেমনি রহিল। কালীময় লোহার ডাণ্ডাটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিলেন। রাস্তায় জনমানব নাই।

নিজের পাড়ায় যখন ফিরিলেন তখন পাড়া নিষুতি; সব বাড়ীতে আলো নিভিয়া গিয়াছে, কেবল মোহিতের বাড়ীর একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

কালীময়ের নিজের বাড়ীও অন্ধকার, কোথাও সাড়াশব্দ নাই। তিনি চোরের মত প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর প্রবেশদ্বার দুইটি—একটি সামনে, একটি পিছনে। কালীময় অনুভব করিয়া দেখিলেন, দুইটি দ্বারই ভিতর হইতে বন্ধ। তিনি তখন নিঃশব্দপদে শয়ন-ঘরের জানালার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার একটি কপাট অল্প খোলা রহিয়াছে; ঘরের ভিতর অন্ধকার। কান পাতিয়া থাকিলে ফিসফিস গলার আওয়াজ শোনা যায়। কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিবার পর কালীময় কণ্ঠস্বর দু'টি চিনিতে পারিলেন—একটি তাঁহার স্ত্রী দামিনীর, অপরটি তাঁহার খাতক মোহিত রক্ষিতের।

পরদিন সকালবেলা পাড়ায় হুলস্থূল কাণ্ড। মোহিত রক্ষিত নিজের স্ত্রীকে খুন করিয়া ফেরারী হইয়াছে। বাড়ীতে পুলিস আসিয়াছে।

মোহিতের বাড়ীর বাঁ পাশে গোপাল নিয়োগীর বাড়ী, ডান পাশে থাকেন প্রতাপ চন্দ। দু'জনেই প্রৌঢ় ব্যক্তি; তাঁহারা পুলিসের কাছে এজেহার দিলেন। মোহিত এবং অন্নপূর্ণার কলহ দৈনন্দিন ব্যাপার। কাল রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় তাঁহারা

মোহিতের বাড়ী হইতে অন্নপূর্ণার চীৎকার ও গালিগালাজের শব্দ শুনিতে পান। মোহিত কোনও দিনই চেঁচাইয়া ঝগড়া করে না, কালও তাহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যায় নাই। হঠাৎ অন্নপূর্ণা—'মেরে ফেললে' 'মেরে ফেললে' বলিয়া দুই তিন বার চীৎকার করিয়াই চুপ করিল। ব্যাপার এতটা চরমে আগে কখনও ওঠে নাই। কিন্তু দাম্পত্য কলহে বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া মূঢ়তা, তাই গোপাল নিয়োগী এবং প্রতাপ চন্দ অত রাত্রে আর বাড়ীর বাহির হন নাই। বিশেষত অন্নপূর্ণা যখন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল তখন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন মোহিত বৌকে পিটাইয়া শায়েস্তা করিয়াছে। সে যে বৌকে খুন করিতে পারে এ সম্ভাবনা তাহাদের মাথায় আসে নাই। সারারাত্রি মৃতদেহ খোলা বাড়ীতে পড়িয়া ছিল, সকালবেলা ঝি আসিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। ঝিয়ের চেঁচামেচিতে গোপালবাবু ও প্রতাপবাবু এ বাড়ীতে আসিয়াছেন এবং মৃতদেহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন।

কালীময় মোহিতের বাড়ীতে গেলেন। পাড়ায় এমন একটা কাণ্ড হইয়া গেল, সকলেই গিয়াছে, তিনি না গেলে খারাপ দেখায়। পুলিস দারোগা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কিছু জানেন?'

এজেহার দিবার ইচ্ছা কালীময়ের ছিল না, তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—'কখন—এই ব্যাপার ঘটেছে?'

দারোগা গোপাল নিয়োগী ও প্রতাপ চন্দকে দেখাইয়া বলিলেন—'এঁদের কথা থেকে মনে হয় রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় খুন হয়েছে। অন্য সাক্ষী নেই, বাড়ীতে ঝি-চাকর কেউ থাকত না।'

কালীময় বলিলেন,—'এগারোটার কথা জানি না, আমি

চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মোহিতের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

দারোগা বলিলেন,—'তাই নাকি! কোথায় দেখা হয়েছিল?'

কালীময় গতরাত্রে মোহিতের সহিত পথে সাক্ষাতের বিবরণ বলিলেন। শুনিয়া দারোগা কহিলেন,—'হুঁ'। আর একটা জোরালো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। মৃত মহিলার গলায় দশ-বারো ভরি ওজনের সোনার হার ছিল, খুনী সেটা নিয়ে গেছে।—মোহিত রক্ষিত আপনার কাছে টাকা ধার নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আপনার কাছে ধার না পেয়ে শুধু-হাতেই জুয়ার আড্ডায় গিয়েছিল। সেখানে বোধহয় আমল পায়নি, তাই বৌয়ের গলার হার নিতে এসেছিল। তারপর—'

দারোগা পাড়ার আরও অনেককে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু নূতন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। মোহিত জুয়াড়ী ছিল, দলে পড়িয়া মাঝে মাঝে মদ খাইত, কিন্তু মোটের উপর মানুষ মন্দ ছিল না; অন্নপূর্ণার সহ্যগুণ ছিল না, মুখের রাশ ছিল না, সামান্য কারণে ঝগড়া বাধাইয়া পাড়া মাথায় করিত—এই তথ্যগুলিই সকলের মুখে প্রকাশ পাইল।

তদন্ত শেষ করিয়া দারোগা লাশ লইয়া চলিয়া গেলেন। পলাতক মোহিত রক্ষিতের নামে পুলিসের হুলিয়া বাহির হইল।

গতরাত্রে প্রায় একটার সময় কালীময় মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। দামিনী ঘুমচোখে আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়াছিল, জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—'মাছ পেলে?'

কালীময় সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—'না।'

আর কোনও কথা হয় নাই। দামিনী গিয়া আবার শয়ন করিয়াছিল ; কালীময় হাত মুখ ধুইয়া তাহার পাশে শয়ন করিয়া ছিলেন। দামিনী কয়েকবার আড়মোড়া ভাঙিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কালীময় সারারাত্রি জাগিয়া ছিলেন।

সকালবেলা দু'জনের মধ্যে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইল। বাহির-বাড়ীতে খুনের খবর পাইয়া কালীময় অন্দরে আসিলেন ; দামিনীকে বলিলেন,—'কাল রাত্রে মোহিত রক্ষিত বৌকে খুন করে পালিয়েছে।'

দামিনী চা তৈরি করিতেছিল, তাহার মুখখানা হঠাৎ শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গেল, সে চকিত-ভয়ার্ত চক্ষু একবার তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নত করিয়া ফেলিল। কালীময় বলিলেন,—'মোহিতকে তুমি দেখেছ নিশ্চয়। আমার কাছে আসতো টাকা ধার করতে।'

দামিনী চোখ তুলিল না, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'কি জানি— মনে পড়ছে না—'

চা পান করিয়া কালীময় ঘটনাস্থলে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিতে বেলা প্রায় দুপুর হইল। বাড়ী আসিয়া তিনি দামিনীকে বলিলেন,—'কাল রাত্তির এগারোটার সময় মোহিত তার বৌকে খুন করেছে।'

দামিনীর চোখে ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া বলিল,—'তাই নাকি ?' কথাটা অত্যন্ত নীরস ও অর্থহীন শুনাইল। মনের স্পর্শহীন নিষ্প্রাণ বাঁধা বুলি।

পরদিন সোমবার। মোহিতের হুলিয়া শহরের বাহিরেও জারি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোহিত এখনও ধরা পড়ে নাই।

শহর হইতে তিন স্টেশন দূরে বড় জংশন। সোমবার সন্ধ্যাবেলা

পুলিসের জমাদার অভয় শিকদার জংশনের সদর প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছিল। সে একরাত্রির জন্য ছুটি লইয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। তাহার বয়স সাতাশ-আটাশ, প্রথম পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে; তাই পুত্রমুখ দর্শনের জন্য সে একরাত্রির ছুটি পাইয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ী বেশী দূরে নয়, ট্রেনে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। কিন্তু জংশন পর্যন্ত আসিয়া সে আটকাইয়া গিয়াছে; ওদিকের ট্রেনের কি গোলযোগ হইয়াছে, আড়াই ঘণ্টা লেট।

অভয় শিকদার অধীর ভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছে। সময় যেন কাটিতে চায় না। সে স্টেশনের পরিচিত মালবাবু ও চেকারদের সঙ্গে গল্প করিয়াছে; স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে ছোট্ট পুলিশ-থানা আছে সেখানে বসিয়া আড্ডা দিয়াছে, পলাতক খুনী আসামী মোহিত রক্ষিত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে…আসামীকে সে চেনে, কিন্তু এখন আর তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সে এতক্ষণে হিল্লী-দিল্লী মক্কা-মদিনা পার হইয়া গিয়াছে।…কাল আবার শেষরাত্রেই ট্রেনে চড়িয়া ফিরিতে হইবে। দারোগাবাবু বলিয়া দিয়াছেন, পুত্রমুত্র-দর্শনে আত্মহারা হইয়া দেরি করিলে চলিবে না, ভোরবেলায় যথাসময়ে ডিউটিতে আসা চাই।

প্ল্যাটফর্মে অন্য গাড়ি আসিতেছে যাইতেছে, যাত্রীরা উঠিতেছে নামিতেছে; একটা ট্রেন চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য প্ল্যাটফর্ম খালি হইয়া যাইতেছে। ক্রমে স্টেশনের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিয়া যাইবার কথা। দুত্তোর!

অভয় ক্লান্তভাবে একজন চেকারকে গিয়া বলিল,—'আর কত দেরি দাদা? গাড়ি আসছে?'

চেকার ববিলেন,—'আসছে, আসছে, আর মিনিট কুড়ি।—তারপর, মিষ্টি খাওয়াচ্ছ কবে?'

অভয় হুঁ-হুঁ করিয়া হাসিয়া বলিল,—'সব হবে দাদা, আগে ছেলেটাকে দেখে আসি। আপাততঃ এই একটা চলুক।' বলিয়া সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া দিল।

চেকার সিগারেট লইয়া প্রস্থান করিলে অভয় অনুভব করিল তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। সম্ভবত মিষ্টি খাওয়ানোর কথায় ক্ষুধার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। সে থার্ডক্লাস যাত্রীদের বিশ্রাম-মণ্ডপের দিকে চলিল, সেখানে খাবার ও চায়ের স্টল আছে।

মণ্ডপের প্রকাণ্ড চত্বরে দুই-চারিজন যাত্রী, কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া সময় কাটাইতেছে; ইলেকট্রিক বাতির আলোতে অন্ধকার দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু আবছায়া কাটে নাই। চায়ের স্টলে উজ্জ্বল আলো আছে। অভয় স্টলে গিয়া চা ও বিস্কুট চাহিল।

স্টলের সামনে কেবল একজন লোক দাঁড়াইয়া চা খাইতেছিল; মাথায় বর্মী ভঙ্গিতে রুমাল বাঁধা, মুখে দু'তিন দিনের দাড়ি। অভয় স্টলে আসিলে সে একটু সরিয়া গিয়া তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চা খাইতে লাগিল।

অভয় প্রথমে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই; বিস্কুট সহযোগে চা খাইতে খাইতে সে একসময় লোকটার মুখের পাশ দেখিতে পাইল। গালে গভীর কালির দাগের মতো দাড়ি সত্ত্বেও অভয় চিনিতে পারিল; হাতে চায়ের পেয়ালাটা একবার পিরিচের উপর নাচিয়া উঠিল। তারপর ক্ষণেকের জন্য সে নিশ্চল হইয়া গেল।

মাথার মধ্যে প্ল্যান ঠিক করিতে করিতে অভয় চা শেষ করিল, স্টলওয়ালাকে পয়সা দিয়া অলসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'পানের দোকানটা কোন্ দিকে?'

স্টলওয়ালা বলিল,—'পান-সিগ্রেট আপনি প্ল্যাটফর্মে পাবেন—হুকারের কাছে।'

যেন কোনই তাড়া নাই এমনি মন্থরপদে অভয় প্ল্যাটফর্মে ফিরিয়া গেল। তারপর ছুটিতে ছুটিতে থানার ঘরে প্রবেশ করিল।

পাঁচ মিনিট পরে সে আবার চায়ের স্টলে ফিরিয়া আসিল। মাথায় রুমাল-বাঁধা লোকটা চা শেষ করিয়া দোকানদারকে পয়সা দিতেছে। অভয় তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

সে ফিরিতেই অভয়ের সহিত তাহার চোখোচোখি হইল। সে অভয়কে চিনিল না, পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে দুই দিক হইতে পুলিশের পোশাকপরা দুইজন লোক অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

অভয় বলিল,—'তোমার নাম মোহিত রক্ষিত। তুমি ফেরারী আসামী।'

মোহিত ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপর ভড়কানো ঘোড়ার মতো পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পালাইতে পারিল না, তিন দিক হইতে তিন জন তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

থানার ঘরে লইয়া গিয়া মোহিতকে সার্চ করা হইল। তাহার কাছে তাহার মৃত স্ত্রীর সোনার হার এবং কয়েক গণ্ডা পয়সা পাওয়া গেল। নগদ টাকার অভাবে সে বেশীদূর পালাইতে পারে নাই।

সে-রাত্রে অভয়ের পুত্রমুখ দর্শন হইল না, গাড়ি আসিয়া চলিয়া গেল। অভয় মোহিতের হাতে হাতকড়া পরাইয়া দুইজন কনেস্টবল সঙ্গে শহরে ফিরিয়া চলিল।

মোহিতের মামলা কমিটিং কোর্ট পার হইয়া দায়রা আদালতে উঠিল। মোহিতের পক্ষে একজন নামজাদা ফৌজদারী উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুই তিন জন জুনিয়র। সরকারের পক্ষে

ছিলেন স্থানীয় প্রবীণ পাবলিক প্রসিকিউটর। কালীময় যদিও কোনও পক্ষেই নিযুক্ত হন নাই, তবু তিনি বরাবর কোর্টে হাজির ছিলেন, অন্য আরও অনেক জুনিয়র উকিল উপস্থিত ছিল। তা ছাড়া শহরের কৌতূহলী জনসাধারণ ভিড় করিয়া মজা দেখিতে আসিয়াছিল।

আসামীর কাঠগড়ায় মোহিত রক্ষিত একমাথা রুক্ষ চুল ও একমুখ দাড়ি লইয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া ছিল।

হাকিম রামরাখাল সেন আসিয়া বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইলে মামলা আরম্ভ হইল। রামরাখাল সেন কড়া মেজাজের বিচারপতি, তাঁহার এজলাসে উকিলেরা বৃথা বাক্যব্যয় বা চেঁচামেচি করিতে সাহস করে না। জুরীনির্বাচন সম্পন্ন হইলে সরকারী উকিল সংক্ষেপে মামলা বয়ান করিলেন—

মোহিত রক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল যুবক, জুয়া এবং আনুষঙ্গিক নানা প্রকার কদাচারে পৈতৃক পয়সা ওড়ানোই তাহার একমাত্র কাজ ছিল। তাহার সতীসাধ্বী স্ত্রী অন্নপূর্ণা তাহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিয়া উঠিত না। এই লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই বচসা হইত। নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্যে বাধা পাইয়া মোহিত স্ত্রীর প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ চরমে উঠিল। মোহিতের জুয়া খেলিবার প্রবৃত্তি চাগাড় দিয়াছিল, অথচ মাসের শেষে তাহার হাতে টাকা ছিল না। সে প্রথমে টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ধার না পাইয়া স্ত্রীর গলার হার বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার মতলব করিল। রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর নিকট হার চাহিল। অন্নপূর্ণা হার দিতে অস্বীকার করিল। তখন মোহিত স্ত্রীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া

তাহাকে খুন করিল এবং তাহার গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়া ফেরারী হইল।

দুই দিন পরে সোমবার সন্ধ্যায় রেলওয়ে জংশনে পুলিস মোহিতকে গ্রেপ্তার করে। তাহার সঙ্গে তখনও তাহার মৃত স্ত্রীর হার ছিল। সেই হার পুলিশ কর্তৃক কেমিক্যাল-অ্যানালিস্টের কাছে প্রেরিত হয়। হার পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে তাহাতে রক্ত লাগিয়া ছিল, এবং সেই রক্ত মোহিতের স্ত্রীর রক্ত; অন্তত একই গ্রুপের রক্ত। ডাক্তারিতে যাহাকে AB গ্রুপের রক্ত বলে, সেই রক্ত।

খুনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী অবশ্য নাই, কিন্তু সব প্রমাণ মিলাইয়া অনিবার্যভাবে প্রতিপন্ন করা যায় যে, মোহিত নিজের স্ত্রীকে খুন করিয়াছে, এ বিষয়ে reasonable doubt-এর অবকাশ নাই।

আসামীকে প্রশ্ন করা করা হইল, তুমি দোষী কি নির্দোষ? মোহিত হাতজোড় করিয়া হাকিমকে বলিল,—'হুজুর, আমি মহাপাপী কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি।' বলিয়া অসহায়ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

আসামী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন,—'হুজুর, আমার মক্কেল বেকসুর, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ কিছুই নাই। সরকারী উকিল আগে নিজের কেস্ প্রমাণ করুন; আসামীর সাফাই এখন উহ্য রহিল, প্রয়োজন হইলে পরে হুজুরে দাখিল করিব।'

অতঃপর একে একে সাক্ষীরা আসিয়া জবানবন্দী দিতে লাগিল। অনেক সাক্ষী। গোপাল নিয়োগী এবং প্রতাপ চন্দ সাক্ষ্য দিলেন। কালীময়েরও সাক্ষ্য দিবার কথা, কিন্তু তিনি পূর্বেই পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে গিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তিনি উকিল, তাঁহার যে তেজারতির কারবার আছে এ কথা প্রকাশ্য

আদালতে প্রচার হইলে তাঁহার নিন্দা হইবে। পাবলিক প্রসিকিউটার বলিয়াছিলেন,—'আপনাকে না হলেও চলে যাবে। দু'জন মাড়োয়ারী সাক্ষী আছে, তাদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব।'

প্রথম দিন তিন চার জন সাক্ষীর এজেহার হইল। মোহিতের উকিল দীর্ঘকাল জেরা করিয়াও সাক্ষীদের টলাইতে পারিলেন না। সেদিনের মতো মোকদ্দমা শেষ হইলে মোহিতকে আবার লক্-আপে লইয়া যাওয়া হইল। সে জামানত পায় নাই।

আদালত হইতে ফিরিয়া কালীময় হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। ঘরে তিনি আর দামিনী ছাড়া আর কেহ নাই। দামিনী খাঁচায় ধরা-পড়া ইঁদুরের মতো ঘরের এদিক হইতে ওদিক ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। সে জানে আজ হইতে মোহিতের মোকদ্দমা আরম্ভ।

কালীময় জলযোগ করিতে করিতে বলিলেন,—'আজ দায়রা এজলাসে লোকে লোকারণ্য, তিল ফেলবার জায়গা ছিল না। সবাই মোহিতের মোকদ্দমা শুনতে এসেছে।'

দামিনী কথা বলিল না, তাহার অস্থিরতা যেন আর একটু বাড়িয়া গেল।

কালীময় আবার বলিলেন,—'মোহিত বললো, সে মহাপাপী, কিন্তু বৌকে খুন করেনি।···হয়তো সত্যি কথাই বলেছে, হয়তো যে-সময় তার বৌ খুন হয় সে-সময়ে সে অন্য কোথাও ছিল। কিন্তু প্রমাণ করবে কি করে?'

দামিনীর ছটফটানি আরও বাড়িয়া গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কালীময় দামিনীর মুখের পানে চোখ তুলিয়া বলিলেন,—

'মোহিত যদি প্রমাণ করতে না পারে যে, খুনের সময় অন্য কোথাও ছিল, তাহলে বোধহয় তার ফাঁসি হবে। রাম-রাখালবাবু বড় কড়া হাকিম—'

দামিনী হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যেন খাঁচার ইঁদুর পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

পরদিন মোহিতের বিচারে আরও সাক্ষী আসিল। সরকারী ডাক্তার শব-ব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট দিলেন; মাথায় ভারী ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে অন্নপূর্ণার মৃত্যু ঘটিয়াছে; মৃত্যুর সময় মধ্য-রাত্রির কাছাকাছি। অন্নপূর্ণার রক্ত AB গ্রুপের। AB গ্রুপের রক্ত খুবই বিরল, শতকরা তিনজনের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর পুলিসের যে দারোগা তদন্তের ভার পাইয়াছিলেন তিনি সাক্ষী দিলেন। দুই জন মাড়োয়ারী সাক্ষী দিল: খুনের রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় মোহিত তাহাদের কাছে টাকা ধার লইতে গিয়াছিল; কিন্তু তাহারা জানিত মোহিত জুয়াড়ী, তাই শুধু-হাতে টাকা ধার দেয় নাই, বলিয়াছিল, বন্ধকী দ্রব্য পাইলে টাকা ধার দিতে পারে। মোহিত চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

সাক্ষীদের জেরা শেষ করিতে করিতে দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ হইল। সাক্ষীরা অটল রহিল।

তৃতীয় দিনের সাক্ষীরা ভাল করিয়া মোহিতের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাইল। প্রথমে অভয় সিকদার আসিয়া মোহিতকে গ্রেপ্তার করিবার ইতিহাস বলিল, গ্রেপ্তারের সময় মোহিত পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাও উল্লেখ করিল। জংশন স্টেশনের পুলিস দারোগা মোহিতের বডি সার্চ করিয়া সোনার হার পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলেন; সোনার হারে রক্ত-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি

উহা খামে ভরিয়া তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে পাঠাইয়া দেন। হারটি একজিবিট রূপে কোর্টে দাখিল করা হইল।

অতঃপর আসিলেন সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক। তিনি বলিলেন, হারে যে-রক্ত লাগিয়াছিল তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ; উহা মানুষের রক্ত এবং AB গ্রুপের রক্ত। শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তারের সাক্ষ্যের সহিত মিলাইয়া কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, মোহিত রক্ষিত রক্তাক্তদেহা মৃতা স্ত্রীর গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়াছিল। এবং সে যদি খুন না করিয়া থাকে তবে ফেরারী হইল কেন? Reasonable doubt-এর কোন অবকাশই নাই।

পাবলিক প্রসিকিউটার হাকিমকে বলিলেন,—'হুজুর, আমার সাক্ষী শেষ হয়েছে, এবার আসামী-পক্ষ সাফাই পেশ করতে পারেন।'

আসামীর উকিল উঠিয়া বলিলেন,—'হুজুর, সরকারী উকিল নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেননি যে আসামী খুন করেছে। যাহোক, আজ আর সময় নেই। কাল আমি সাফাই সাক্ষী দাখিল করব। তারা প্রমাণ করবে যে খুনের রাত্রে আসামী অন্যত্র ছিল।'

আসামীর কাঠগড়ায় মোহিত একবার ভীত-ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিল, যেন চীৎকার করিয়া কিছু বলিতে চাহিল, তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

উকিল কিরূপ সাফাই সাক্ষী দিবেন তাহা সে জানিত না। উকিল মোহিতের কাছে সত্যকথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল হইয়া নিজেই সাক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সে-রাত্রে শয়নের পূর্বে কালীময় আলমারি হইতে হুইস্কির বোতল বাহির করিলেন। গেলাসে হুইস্কি ঢালিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া গেলাস হাতে বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। দামিনী শয়নের পূর্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখে ক্রীম মাখিতেছিল।

কালীময় বলিলেন,—'মোহিতকে দেখে দুঃখ হয়। কী যেন বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। মোকদ্দমার অবস্থা ভাল নয়, বোধহয় ওর ফাঁসি হবে।'

দামিনী কালীময়ের দিকে মুখ ফিরাইল না, দু'হাতের আঙুল দিয়া মুখে ক্রীম ঘষিতে লাগিল।

কালীময় গেলাসে চুমুক দিয়া বলিলেন,—'আমার কি মনে হয় জানো? এর মধ্যে স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার আছে। মোহিতের সঙ্গে বোধহয় কোনও কুলবধূর নটঘট ছিল। যে-রাত্রে খুন হয় সে-রাত্রে মোহিত তার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু সে-কথা এখন বলতে পারছে না। এমন অনেক অপরাধ আছে যা স্বীকার করার চেয়ে ফাঁসি যাওয়াও ভাল।'

দামিনী আলো নিভাইয়া দিয়া বিছানায় প্রবেশ করিল। কালীময় অন্ধকারে হুইস্কির গেলাস শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। লেপের মধ্যে দামিনীর হাতে তাঁহার হাত ঠেকিল; দামিনীর হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কালীময় বলিলেন,—'মোহিত লুচ্চা-লম্পট হোক, ওর মনটা ভদ্র। যার সঙ্গে ওর পিরিত তার কিন্তু উচিত এগিয়ে আসা, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলা—মোহিত খুনের রাত্রে কোথায় ছিল। নিন্দে হবে, কলঙ্ক হবে; তবু একটা নির্দোষ মানুষের প্রাণ তো বাঁচবে। উচিত কিনা তুমিই বল।'

দামিনী লেপের ভিতর হইতে ফোঁস করিয়া উঠিল,—'আমি

কি জানি!' মোহিতের মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই সে প্রথম কথা বলিল।

কালীময়ের ইচ্ছা হইল শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের চৌকির উপর রাত্রি যাপন করেন। কিন্তু—

সতীসাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা নষ্ট-স্ত্রীলোকের চৌম্বক-শক্তি আরও প্রবল।

চতুর্থ দিন মোহিতের উকিল আদালতে তিনটি সাফাই সাক্ষী পেশ করিলেন। সাক্ষী তিনটিকে দেখিলেই চেনা যায়, নাম-কাটা সেপাই। ভদ্রসন্তান হইলেও ইহারা সমাজের যে-স্তরে বাস করে তাহাকে সমাজের অধমাঙ্গ বলা চলে। নেশা, জুয়া এবং সর্ববিধ অসাধুতা তাহাদের মুখে পোস্ট-অফিসের শিলমোহরের মতো কালো ছাপ মারিয়া দিয়াছে।

তাহারা একে একে আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, খুনের রাত্রে তাহারা তিনজনে মোহিতের সঙ্গে রাত্রি সাড়ে ন'টা হইতে একটা পর্যন্ত ব্রিজ খেলিয়াছিল। ব্রিজ খেলা জুয়া নয়, game of skill, সুতরাং জুয়াখেলা সম্বন্ধেও তাহারা নিষ্পাপ। শহরে একটি সিনেমা-মন্দির আছে, তাহারই সংলগ্ন একটি কুঠুরীতে বসিয়া তাহারা ব্রিজ খেলিয়াছিল। সিনেমা-মন্দিরের অ্যাসিস্টাণ্ট পুরোহিত তাহাদের বন্ধু, তাই উক্ত কুঠুরীতে বসিয়া তাহারা প্রায়ই তাস-পাশা খেলে। সেদিন রাত্রি একটার সময় মোহিত উঠিয়া বাড়ী চলিয়া যায়। তারপর কী ঘটিয়াছে তাহারা জানে না।

ইহাদের সাক্ষ্য ধোপে টিকিল না, পাবলিক প্রসিকিউটারের জেরায় ভাঙিয়া পড়িল। দেখা গেল, ব্রিজ খেলায় হরতন বড় কি চিড়িতন বড় তাহা তাহারা জানে না; সিনেমায় সেদিন কোন্ ছবি

প্রদর্শিত হইতেছিল তাহাও তাহারা স্মরণ করিতে পারিল না। একজন সাক্ষী বলিয়া ফেলিল, সেদিনটা শুক্রবার ছিল কি শনিবার ছিল তাহা তাহার ঠিক স্মরণ নাই।

তিনটি সাক্ষীর এজেহার শেষ হইতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। হাকিম রামরাখালবাবুর ললাটে ভ্রূকুটি জমা হইতেছিল, তিনি আসামীর উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এরকম সাক্ষী আপনার আর ক'টি আছে?'

উকিল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে, আমার কেস্ ক্লোজ করলাম, আর সাক্ষী দেব না।'

'ভাল।' হাকিম একবার দেয়াল-ঘড়ির দিকে দৃক্‌পাত করিলেন,—'এবার তাহলে আরগুমেণ্ট সুরু করুন!'

—'হুজুর!'

আসামীর উকিল বহস্ আরম্ভ করিবার পূর্বে কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করিতে করিতে জুনিয়রদের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন, এমন সময় কালীময় কোর্টের পিছনদিকের একটি বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'হুজুর, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি এই মোকদ্দমায় কোর্টের পক্ষ থেকে সাক্ষী দিতে চাই।'

হাকিম চকিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া মুখ তুলিলেন।

কালীময় কোর্টের সামনে আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিলেন; হাকিমকে বলিলেন,—'হুজুর, আমি একজন উকিল, এই শহরের বাসিন্দা, আসামীর প্রতিবেশী। মামলা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি, হুজুরে তা পেশ করবার অনুমতি দেওয়া হোক।'

হাকিম কিয়ৎকাল স্থিরচক্ষে কালীময়কে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ঘাড় নাড়িলেন।

কালীময়কে হলফ পড়ানো হইল। তিনি হাকিমের দিকে

ফিরিয়া ধীর মন্থর কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'হুজুর, এই মামলার গোড়া থেকে আমি কোর্টে হাজির আছি, সব সাক্ষীর জবানবন্দী শুনেছি। সরকারী উকিল সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে গত ১৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ এগারোটার *সময় মোহিত রক্ষিত তার স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে খুন করেছে।* হুজুর, অন্নপূর্ণাকে কে খুন করেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি সে-রাত্রে এগারোটার সময় মোহিত তার নিজের বাড়ীতে ছিল না।

কালীময় একটু থামিলেন। হাকিম গভীর ভ্রূকুটি করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'কোথায় ছিল?'

কালীময় বলিলেন,—'আমার বাড়ীতে, হুজুর।'

হাকিম রামরাখালবাবুর অধরোষ্ঠ বিদ্রূপে বক্র হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—'রাত্রি এগারোটার সময় আসামী আপনার বাড়ীতে কি করছিল? আপনার সঙ্গে তাস খেলছিল?'

কালীময় ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন,—'না হুজুর, আমি বাড়ীতে ছিলাম না।'

হাকিম ভ্রূ তুলিলেন,—'তবে?'

মাথা হেঁট করিয়া কালীময় বলিলেন,—'আমি বাড়ী নেই জানতো বলেই মোহিত আমার বাড়ীতে গিয়েছিল। মোহিত আমার স্ত্রীর উপপতি।'

কোর্ট-ঘরের মাথার উপর বজ্রপাত হইলেও এমন লোমহর্ষণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না। কোর্টে উপস্থিত লোকগুলি যেন ক্ষণকালের জন্য অসাড় হইয়া গেল, তারপর পিছনদিকের ভিড়ের মধ্যে একটা চাপা কলরব উঠিল। হাকিম রামরাখালবাবুর কষায়িত নেত্রপাতে আবার তৎক্ষণাৎ কক্ষ নীরব হইল বটে, কিন্তু

সকলের উত্তেজিত চক্ষু পর্যায়ক্রমে একবার কালীময়ের ও একবার আসামী মোহিত রক্ষিতের পানে ফিরিতে লাগিল। মোহিত কালীময়কে কাঠগড়ায় উঠিতে দেখিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, এখন দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রামরাখালবাবু সাক্ষীর দিকে ফিরিলেন,—'আপনি বলছেন আপনি বাড়ী ছিলেন না।'

'আজ্ঞে না, আমি রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।'

'হুঁ। তাহলে আপনি জানলেন কি করে যে আসামী আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল?'

'আজ্ঞে, আমি আবার ফিরে এসেছিলাম। আমি দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেছি। কিছুদিন থেকে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে আমার স্ত্রীর চালচলন ভাল নয়। তাই সেদিন যাচাই করবার জন্যে মাছ-ধরার ছল করে বেরিয়েছিলাম।'

হাকিম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর কড়া সুরে বলিলেন,—'এতদিন এ কথা বলেননি কেন?'

কালীময় বলিলেন,—'লজ্জায় বলতে পারিনি, হুজুর। নিজের স্ত্রীর কলঙ্কের কথা কে প্রকাশ করতে চায়? তা ছাড়া, মোহিত আমার বন্ধু নয়, আমার শত্রু, তাকে বাঁচাবার কোনও দায় আমার নেই। কিন্তু যখন দেখলাম তার ফাঁসির সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে পড়েছে তখন আর থাকতে পারলাম না। যতবড় পাপীই হোক, সে খুন করেনি।'

এই সময় মোহিত চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল।

সরকারী উকিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'হুজুর, আমি সাক্ষীকে জেরা করতে চাই।'

হাকিম বলিলেন,—'অবশ্য। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কাল সকালে সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হবে।'

সেদিন কোর্ট উঠিল।

সন্ধ্যার সময় কালীময় গৃহে ফিরিলেন। মফস্বলের শহরে পরের কেচ্ছা হাওয়ার আগে ছোটে। কালীময় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, শয়নঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তিনি কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিলেন, কিন্তু দামিনী বাহির হইল না।

কালীময় বাহিরের ঘরে চৌকির উপর শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

আদালতের ভিড় প্রথম দিনের ভিড়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে; বিচার-গৃহ ছাপাইয়া, বারান্দা ছাপাইয়া উদ্বেল জনতা মাঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা কলিকাতার কয়েকজন সাংবাদিক রাত্রে খবর পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছি এবং বিচারকক্ষে স্থান করিয়া লইয়াছি।

আসামীর কাঠগড়ায় মোহিতকে দেখা যাইতেছে না, সে কাঠগড়ার খাঁচার মেঝেয় বসিয়া সর্বজনের চক্ষু হইতে নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে।

কালীময়ের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। তিনি নূতন কিছু বলিলেন না, পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলিলেন।

মোহিতের উকিল অপ্রত্যাশিত সাক্ষী পাইয়া ভরাডুবি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তিনি কালীময়কে জেরা করিলেন না। পাবলিক প্রসিকিউটার ডালকুত্তার মতো কালীময়কে আক্রমণ করিলেন, সমধর্মী উকিল বলিয়া রেয়াৎ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার জেরা ব্যর্থ হইল, কালীময়কে তিনি টলাইতে পারিলেন না।

সওয়াল জবাবের কিয়দংশ নিম্নে দিলাম।—

প্রশ্ন : কতদিন হল আপনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন ?

উত্তর : বছর দুই হল।

প্রশ্ন : কবে আপনি জানতে পারলেন যে আপনার স্ত্রীর চালচলন ভাল নয় ?

উত্তর : জানতে পারিনি, সন্দেহ করেছিলাম।

প্রশ্ন : কবে সন্দেহ করেছিলেন ?

উত্তর : এই ঘটনার দু'চার দিন আগে।

প্রশ্ন : কী দেখে সন্দেহ হয়েছিল ?

উত্তর : চালচলন দেখে।

প্রশ্ন : স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু বলেছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কেন বলেননি ?

কালীময় জিজ্ঞাসু ভাবে হাকিমের দিকে চাহিলেন। হাকিম বলিলেন,—'প্রশ্ন অবান্তর। অন্য প্রশ্ন করুন।'

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন সে-রাত্রে নিজের শোবার ঘরের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতেছিলেন। ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত আড়ি পেতেছিলেন ?

উত্তর : আন্দাজ সওয়া দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত।

প্রশ্ন : এই পৌনে দু'ঘণ্টা আপনি চুপটি করে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ঘর অন্ধকার ছিল, কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না ?

উত্তর : না।

শ্নপ্র : কিন্তু ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ওরা বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল ?

উত্তর : না, চুপিচুপি কথা বলছিল।

প্রশ্ন : চুপিচুপি কথা বলা সত্ত্বেও আপনি আসামীর গলা চিনতে পারলেন ?

উত্তর : শুধু গলা শুনে নয়, ওদের কথা থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম।

প্রশ্ন : কী কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন ?

উত্তর : আসামী একবার বলেছিল—'মোহিত রক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে, প্রাণ গেলেও ভদ্রমহিলার কলঙ্ক হতে দেবে না ; মোহিত রক্ষিতের মুখ থেকে এ কথা কেউ জানতে পারবে না।'

প্রশ্ন : আর কি-কি কথা শুনেছিলেন ?

কালীময় চক্ষু নত করিয়া নীরব রহিলেন। হাকিম উকিলকে বলিলেন,—'অন্য প্রশ্ন করুন।'

প্রশ্ন : যাক। আপনি যখন জানতে পারলেন যে আপনার স্ত্রী ব্যভিচারিণী, তখন আপনার রক্ত গরম হয়ে ওঠেনি ? রাগ হয়নি ?

উত্তর : হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হয়েছিল।

প্রশ্ন : ভয় কিসের ?

উত্তর : রাগের মাথায় ইচ্ছে হয়েছিল দোর ভেঙে ঢুকে দু'জনকেই ঠ্যাঙাই। কিন্তু ভয় হল , আমি একা, ওরা দু'জন—ওরা যদি আমায় খুন করে ?

প্রশ্ন : তাই ফিরে গিয়ে মাছ ধরতে লাগলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : (ঘৃণাভরে) আপনি মানুষ না কেঁচো !

কালীময় নীরব রহিলেন। হাকিম কড়া স্বরে সরকারী উকিলকে বলিলেন,—'আপনি বার বার Evidence Act-এর বাইরে যাচ্ছেন। এসব প্রশ্ন অবান্তর এবং অসঙ্গত। আপনার যদি আর কোনও প্রশ্ন না থাকে, আপনি বসে পড়ুন।'

'আর একটা প্রশ্ন, হুজুর'—সরকারী উকিল সাক্ষীর দিকে ফিরিলেন।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী এখনও আপনার বাড়ীতেই আছে ?

উত্তর : আজ সকাল পর্যন্ত ছিল।

প্রশ্ন : এই ব্যাপারের পর তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কী রকম ?

হাকিম আবার ধমক দিয়া উঠিলেন—'অসঙ্গত—অবান্তর। কেসের সঙ্গে প্রশ্নের কোনও সম্বন্ধ নাই।'

কালীময় হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'হুজুর, প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আপত্তি নেই।—আমি প্রৌঢ়, যুবতীকে বিবাহ করা আমার উচিত হয়নি। তাই যখন স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্রের কথা জানতে পারলাম তখন মনে মনে স্থির করেছিলাম, কোনও রকম হাঙ্গামা না করে চুপিচুপি ওকে ত্যাগ করব। কিন্তু মাঝখান থেকে এই খুনের মামলা এসে সব গণ্ডগোল করে দিল।'

সরকারী উকিল একবার হাকিমের মুখ দেখিলেন, একবার জুরীদের মুখ দেখিলেন ; তাঁদের মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মামলার হাল একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। তিনি আর প্রশ্ন না করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে মোহিতের উকিল গিয়া মোহিতের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন,—'হুজুর, এবার আসামী নিজের মুখে তার statement দেবে।'

কোর্টের সকলে শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া বসিল।

মোহিত ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাড়ি গোঁফ ও রুক্ষ চুলের ভিতর হইতে তাহার মুখখানা দেখিয়া মনে হয়, সে একটা পাগল ভিখারী। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল। সে হাতজোড় করিয়া ভগ্নস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল,—'ধর্মাবতার, আমি মহাপাপী, ফাঁসিই আমার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি। কালীময়বাবু যা বলেছেন তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। তিনি যদি এসব কথা না বলতেন তাহলে আমিও চুপ করে থাকতাম। কিন্তু এখন চুপ করে থাকার কোনও সার্থকতা নেই।

'সে-রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময় আমি নিজের বাড়ীতে ফিরে যাই। গিয়ে দেখলাম, সদর দরজা খোলা, সামনের ঘরে আলো জ্বলছে, আমার স্ত্রী অন্নপূর্ণা মেঝেয় ম'রে প'ড়ে আছে। আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাকেই সবাই খুনী বলে সন্দেহ করবে; অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই, এ কথা সবাই জানে। প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া।

'কিন্তু আমার পকেটে মাত্র দু'তিন টাকা আছে, দু'তিন টাকায় কতদূর পালাতে পারব? আমি অন্নপূর্ণার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে পালালাম। তাতে যে রক্ত লেগে আছে তা জানতে পারিনি।

'সেই রাত্রেই জংশনে পৌঁছুলাম। কিন্তু সেখান থেকে দূর-দেশে যেতে হলে টাকা চাই। জংশনে কাউকে চিনি না, কার কাছে হার বিক্রি করব? রবিবার সারাদিন জংশনে লুকিয়ে রইলাম, কিন্তু হার বিক্রি করার সাহস হল না। ভয় হল, হার বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যাব।

'সোমবার দিনটাও জংশনে কাটল। তারপর সন্ধ্যেবেলা ধরা

পড়ে গেলাম। হুজুর, এই আমার বয়ান। আমি যদি একটি মিথ্যেকথা বলে থাকি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।'

রুদ্ধশ্বাস বিচারগৃহে আসামীর উকিল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'হুজুর, এর পর আমি আর একটা কথাও বলতে চাই না। সরকারী উকিল তাঁর ভাষণ দিতে পারেন।'

সরকারী উকিল দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ভাষণ শেষ হইবার আগেই লাঞ্চের বিরাম আসিল, বিরামের পর তিনি আবার ভাষণ চালাইলেন। কালীময় যে মিথ্যা-সাক্ষী, নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিতেছেন, এই কথা তিনি বার বার জুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার কথা কিন্তু কাহারও মনে স্থান পাইল না; তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে হাকিম জুরীদের মামলার মোদ্দাকথা বুঝাইয়া দিলেন। জুরী উঠিয়া গিয়া পাঁচ মিনিট নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিলেন, তারপর ফিরিয়া আসিয়া রায় দিলেন—আসামী নির্দোষ।

হুইস্কির বোতলটি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, তলায় মাত্র দুই আঙুল পরিমাণ তরল দ্রব্য ছিল। রাত্রি দশটা বাজিতে বেশী দেরি নাই। কালীময়বাবুর বসিবার ঘরে বোতল মাঝখানে রাখিয়া আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসিয়া আছি। আমার মাথার মধ্যে রুমঝুম নূপুর বাজিতেছে, কিন্তু বুদ্ধিটা পরিষ্কার আছে। কালীময় রক্তাভ নেত্রে মদের বোতলটার দিকে চাহিয়া আছেন।

আমি বলিলাম,—'তার পর?'

কালীময় বোতল হইতে চক্ষু সরাইলেন না, বলিলেন,—'কাল কোর্ট থেকে বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম দামিনী পালিয়েছে। কোথায় গেছে জানি না। হয়তো দূরসম্পর্কের ভায়ের কাছেই ফিরে গেছে।'

'আর মোহিত?'

'সে আছে। কাল রাত্রে এসেছিল, পায়ে ধরে মাপ চেয়ে গেল।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। আমার মাথার মধ্যে ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে একটা বেতালা চিন্তা ঘুরিতেছে। শেষে বলিলাম,—'একটা প্রশ্নের কিন্তু ফয়সালা হল না।'

কালীময় আমার পানে রক্তাক্ত চোখ তুলিলেন।

বলিলাম,—'অন্নপূর্ণাকে খুন করল কে?'

কালীময় নির্নিমেষ আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বলিলাম,—'আপনি সে-রাত্রে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে আড়ি পাততে এসেছিলেন। আদালতে লোহার ডাণ্ডার কথা কিন্তু বলেননি।'

কালীময় আরও কিছুক্ষণ আমাকে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন,—'তোমার বিশ্বাস আমি অন্নপূর্ণাকে খুন করেছি!'

বলিলাম,—'বিশ্বাস নয়, সন্দেহ। আপনি পৌনে দু'ঘণ্টা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। আপনি কেঁচো নয়, মানুষ।'

হঠাৎ কালীময় হুইস্কির বোতলটা ধরিয়া নিজের গেলাসের মধ্যে উজাড় করিয়া দিলেন। তাহাতে জল মিশাইলেন না, নিরম্বু তরল আগুন গলায় ঢালিয়া দিলেন। আমি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম

তিনি বলিলেন,—'হ্যাঁ, অন্নপূর্ণাকে আমি খুন করেছিলাম। তোমাকে বলছি, কিন্তু তুমি যদি অন্য কাউকে বল, আমি অস্বীকার করব। আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই।

আমার মাথার মধ্যে বেতালা চিন্তাটা এবার তালে নাচিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলাম,—'অন্নপূর্ণাকে খুন করলেন কেন? সে তো কোনও অপরাধ করেনি।'

কালীময় বলিলেন,—'তাকে খুন করবার মতলব ছিল না। নিজের ঘরের ব্যাপার দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। আমি গিয়েছিলাম প্রতিশোধ নিতে।'

'প্রতিশোধ নিতে!'

'হ্যাঁ। মোহিত আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে, তাই আমি গিয়েছিলাম তার গালে চুনকালি দিতে। কিন্তু অন্নপূর্ণা অন্য জাতের মেয়ে, সে দামিনী নয়। আমার মতলব যখন সে বুঝতে পারল তখন আমার কোঁচা চেপে ধরে বললো,—"তবে হাড়-হাবাতে অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, তোর মনে এত ময়লা! দাঁড়া তোর পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি!" এই ব'লে সে আমার কোঁচা ধরে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল—"মেরে ফেললে! মেরে ফেললে!"—তখন আর আমার উপায় রইল না, এখনি চীৎকার শুনে পাড়াপড়শী এসে পড়বে। হাতে লোহার ডাণ্ডা ছিলই—'

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে আমি উঠিবার উপক্রম করিলাম; বলিলাম,—'আচ্ছা, রাত হয়ে গেছে, আজ তাহলে উঠি।'

কালীময় চকিতে চোখ তুলিলেন, তাঁহার মুখ হইতে স্মৃতির গ্লানি মুহূর্তে মুছিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—'এত রাত্রে কোথায় যাবে? আজ এখানেই থেকে যাও। খিদে পেয়েছে? দেখি রান্নাঘরে কিছু আছে কিনা।'

প্রিয় চরিত্র

বড় মুশকিলে পড়িয়াছি। জনৈক সম্পাদক জানিতে চাহিয়াছেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে আমি কোন্‌টিকে বেশি ভালবাসি।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সহজ? ত্রিশ বছর ধরিয়া গল্প লিখিতেছি। কত চরিত্র ছায়াবাজির মত চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে দুই চারিটিকে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভাল-বাসিবার অবকাশ পাইলাম কৈ? ভালবাসিতে হইলে দু'চার দিন একসঙ্গে থাকিতে হয়, জীবনের শীত-গ্রীষ্ম শরৎ-বসন্ত একসঙ্গে ভোগ করিতে হয়, হাসি-কান্নার ভাগ লইতে হয়। তারপর, ভালবাসা যদি বা জন্মিল, ভালবাসা কতদিন থাকে? সাবানের বুদ্বুদের মত নানা রঙের খেলা দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ এক সময় ফাটিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আমার হৃদয়েও কত বুদ্বুদ ফাটিয়াছে তাহার কি হিসাব রাখিয়াছি? অতীতে কাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, এবং এখন কাহাকে বেশী ভালবাসি তাহা কেমন করিয়া বলিব!

আমার অপবাদ আছে আমি গজদন্ত স্তম্ভের চূড়ায় বাস করি। যাঁহারা আমাকে এই অপবাদ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের চোখে যদি ধূম্র কাঁচের চশমা না থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, স্তম্ভটা গজদন্তের নয়, চুনকাম করা ইঁটপাথরের। বেশ মজবুত স্তম্ভ, পাকানো সিঁড়ি দিয়া ইহার ডগায় উঠিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তবে স্তম্ভের মাথায় যাহারা বাস করে তাহাদের জীবনে সঙ্গী-সাথী বেশি জোটে না, আমার জীবনও একটু নিঃসঙ্গ।

একদা রাত্রিকালে আমি স্তম্ভশীর্ষে বসিয়া নিজের মুশকিলের কথা

চিন্তা করিতেছি, মৃৎপ্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। বিস্মিত হইলাম; দিনের বেলাই আমার কাছে কেহ আসে না, রাত্রে কে আসিল।

রোগাপানা একটি লোক। চেহারা দেখিয়া বয়স অনুমান করা যায় না; চল্লিশ বছর হইতে পারে, আবার চার হাজার বছরও হইতে পারে। আমার সম্মুখে আসিয়া বসিল; একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

দ্বিধাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলাম,—'চিনি চিনি মনে হচ্ছে বটে —কিন্তু—'

সে বলিল—'আমি জাতিস্মর।'

মাথা চুলকাইয়া বলিলাম,—'জাতিস্মর! হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকদিন আগে তোমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছিল, মনে পড়েছে; তুমি রেলের কেরানী ছিলে—'

জাতিস্মর তীব্রস্বরে বলিল,—'রেলের কেরানী ছিলাম এই কথাটাই মনে রেখেছেন। সোমদত্তাকে ভুলে গেছেন! উল্কাকে ভুলে গেছেন!'

উল্কা—বিষকন্যা উল্কা—যাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাকে দেহ দিতে পারে নাই। সোমদত্তা—নিজের ধর্ম দিয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। তাহাদের অনেকদিন আগে চিনিতাম, এক সময় উহারা আমার মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু উহাদের ভালবাসিয়া-ছিলাম কি? ভালবাসিলে কি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম?

বলিলাম,—'আসল কথাটা কি জানো—'

জাতিস্মর লোকটার মাথায় ছিট আছে, সে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জনী তুলিয়া বলিল,—'আপনি উল্কাকে ভুলে গেছেন, সোমদত্তাকে ভুলে গেছেন, রুমাকেও মনে নেই। আপনারা—এই

লেখক জাতটা বড় লঘুচিত্ত, ভালবাসতে জানেন না। শুধু কুৎসা রটাতে জানেন। ছিঃ।'

জাতিস্মর ধিক্কার দিয়া চলিয়া গেল।

বসিয়া বসিয়া তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সে জন্মে জন্মে বারবার বহু নারীকে ভালবাসিয়াছিল। আমি যদি একই জন্মে পর্যায়ক্রমে বহু নারীকে ভালবাসি তবে তাহা ভালবাসা হইবে না, অতি নিন্দনীয় কার্য হইবে। কেন? একটি নারীকে সারা জীবন ধরিয়া ভালবাসিব তবেই তাহা ভালবাসা হইবে—এমন কি কথা আছে! প্রাণে ভালবাসা থাকিলেই তো হইল।—

পায়ের শব্দ শুনিতে পাই নাই, চোখ তুলিয়া দেখি একটি যুবতী আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আনন্দময়ী মূর্তি কিন্তু বিহ্বলতা নাই। সর্বাঙ্গে সোনার গহনা, রূপের বুঝি অবধি নাই। বিদ্যাপতির শ্লোক মনে পড়িয়া যায়—'নব জলধরে বিজুরি রেখা দন্দ পসারি গেলি।' গলায় আঁচল দিয়া আমাকে প্রণাম করিল, তারপর পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—'আমি চুয়া।'

বলিলাম,—'পরিচয় দিতে হবে না, তোমাকে দেখেই চিনেছি। এত সুন্দর মেয়েকে কি ভোলা যায়!'

চুয়া লজ্জারুণ মুখে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। প্রশ্ন করিলাম,—'চন্দন বেনে কেমন আছে?'

চুয়া শঙ্কাভরা চোখ তুলিয়া বলিল,—'তিনি আবার সাগরে গেছেন।'

তাহাকে ভরসা দিবার জন্য বলিলাম,—'বেনের ছেলে সাগরে যাবে না? দু'দিন পরেই ফিরবে, ভয় কি।—নিমাই পণ্ডিতের খবর ভাল?'

চুয়া একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'ঠাকুর সন্ন্যাস

নিয়েছেন। উনি তো আর মানুষ ছিলেন না, দেবতা ছিলেন। কতদিন সংসারে থাকবেন।'

'আর মাধাই ?'

'তার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে মা বলে ডেকেছেন।'

আমিও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম—'বেশ বেশ। সব খবরই ভাল দেখছি। তা তুমি আমার কাছে এলে কেন বলো দেখি। তোমাকে ভালবাসি কি না জানতে চাও ?'

সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—'আপনি আমাকে সর্বনাশের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাই আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।'

সে আবার গলায় আঁচল দিয়া আমাকে প্রণাম করিল। বলিলাম,—'চিরায়ুষ্মতী হও, পাকা মাথায় সিঁদুর পর। তোমাকে উদ্ধার করেছিল চন্দন আর নিমাই পণ্ডিত। কিন্তু আমিও তোমাকে ভালবাসি। আচ্ছা এস।'

চুয়া চলিয়া গেল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধাই-এর কথা মনে আসিতে লাগিল। মহাপাষণ্ড মাধাই মহাপুরুষের চরণস্পর্শে উদ্ধার হইয়া গেল। আমার জীবনে এমনি কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিবে কি ? মনে তো হয় না। মহাপুরুষেরা বাছিয়া বাছিয়া অতি বড় পাষণ্ডদেরই কৃপা করেন, ছোটখাটো পাষণ্ডদের প্রতি তাঁহাদের নজর নাই।

আরে ব্বাস্ রে! ব্যাপার কি ? একসঙ্গে অনেকগুলি লঘুক্ষিপ্র পদধ্বনি ; তারপর এক ঝাঁক যুবতী আমার স্তম্ভগৃহে ঢুকিয়া পড়িল এবং আমাকে ঘিরিয়া বসিল।

প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া একে একে সকলের মুখ দেখিলাম। কেহ আনারকলি, কেহ রজনীগন্ধা, কেহ অপরাজিতা। সকলেরই মুখ

চেনা, কিন্তু সকলের নাম মনে নাই। বলিলাম,—'রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তোমরা সবাই ভাল। গুরুদেবের কথার প্রতিবাদ করতে চাই না, কিন্তু তোমাদের কী মতলব বল দেখি। রাত্তির বেলা এক-জোট হয়ে নিরীহ ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করেছ কেন?'

একটি মুখফোড় মেয়ে বেণী দুলাইয়া বলিল,—'আপনি মোটেই নিরীহ ব্রাহ্মণ নয়, খালি খোঁচা দিয়ে কথা বলেন।'

তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম,—'তোমাকে চিনেছি। তুমি করবী। কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা কখন বললাম? তোমাদের ঐ দোষ সত্যি কথা সইতে পার না।—যাক, বিমলা কেমন আছে? সুহাসকে দেখছি না!'

করবী বলিল,—'বৌদি এলেন না, তাই হাসি-দি'ও এল না। আমাদেরও আসতে দিচ্ছিল না, বলছিল কেন ভদ্রলোককে জ্বালাতন করবি। আমরা জোর করে চলে এলুম।'

বলিলাম,—'তোমাদের মধ্যে দু'একজনের সুবুদ্ধি আছে তাহলে। কিন্তু এসেছ ভালই করেছ। এখন বল মতলবটা কি?'

এবার অন্য একটি মেয়ে কথা বলিল; কালো মেয়ে, চোখের কূলে কূলে হাসি খেলা করিতেছে, বলিল,—'আমরা জানতে এলুম কেন আপনি আর আমাদের ভালবাসেন না, কেন আমাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছেন।'

বলিলাম,—'তোমার নাম ভুলিনি। তুমি, রুচিরা।'

আর একটি মেয়ে বলিল,—'আর আমি? আমার নাম বলুন দেখি।'

অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি চুয়ার মত সুন্দরী নয়, কিন্তু ভারি সুশ্রী··· মনে হয় যেন ছেলেবেলায় স্নানযাত্রার মেলায় হারাইয়া গিয়াছিল, এক মধ্যবিত্ত দম্পতী তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া

মানুষ করেন ··· তারপর? ··· বড়মানুষের একটা খেয়ালী ছেলে ··· একটা তোৎলা···

মেয়েটি ম্লান হাসিয়া বলিল,—'বলতে পারলেন না তো! আমি কেয়া।'

মনে দুঃখ হইল। সত্যই তো, মানুষ কেন ভুলিয়া যায়? হে মহাকাল, তুমি তো কিছু ভোল না, আমাদের অস্থি-মজ্জায় তোমার অভিজ্ঞান অঙ্কিত আছে; তবে আমরা ভুলি কেন? আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি বৈ দু'টি ভালবাসার স্থান নাই, তাই বুঝি একটিকে ঘরে আনিবার সময় আগেরটিকে বিদায় দিতে হয়!

করবী আবেগ-প্রবণ কণ্ঠে বলিল,—'বলুন, কেন আপনি আমাদের ভুলে গেছেন, কেন আর ভালবাসেন না!'

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম,—'ছাখো, তোমাদের সকলকেই তো আমি একটি একটি ভালবাসার পাত্র জুটিয়ে দিয়েছি, তবে আবার আমার ভালবাসা চাও কেন? মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়, মেয়েও নিজের স্বামী নিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। তখন আর বাইরের ভালবাসা চায় না। কিন্তু তোমাদের এ কি? ভালবাসায় কি তোমাদের অরুচি নেই?'

সকলে মুখ তাকাতাকি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল— 'অমৃতে নাকি অরুচি হয়? আপনি হাসালেন।'

করবী বলিল—'কিন্তু আপনার ভালবাসার ওপর আমাদের দাবী আছে।'

বলিলাম,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। তোমাদের কাউকেই আমি ভুলিনি, সবাই আমার অবচেতনার তোষাখানায় জমা হয়ে আছো। তবে কি জানো, চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল। তোমরাও তো এতদিন আমাকে ভুলে ছিলে; আজ মাসিক পত্রে

প্রশ্ন উঠেছে, আমার প্রিয় চরিত্র কোনটি, তাই আমাকে মনে পড়েছে।'

একটি মেয়ে, তার নাম বোধহয় আলতা, বলিল,—'মোটেই না, আপনার দিকে আমাদের বরাবর নজর আছে। আপনি যে-কাণ্ড করে চলেছেন! আজ রট্টা যশোধরা, কাল কুহু-গুঞ্জা-শিখরিণী, পরশু বীরশ্রী-যৌবনশ্রী-বান্ধুলি। আরও কত মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন কে জানে।—গা জ্বলে যায়।'

আমার অবস্থা খুব কাহিল হইয়া পড়িল। ভালবাসায় যাহাদের দুর্নিবার লোভ, অথচ অন্যকে ভালবাসি দেখিলে যাহাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাদের সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই। কি বলিয়া ইহাদের ঠাণ্ডা করিব ভাবিতেছি, হেনকাল পিছনদিকে পুরুষকণ্ঠের স্নিগ্ধ-মধুর হাসি শুনিতে পাইলাম। তারপরই সংস্কৃত ভাষায় সম্বোধন,—'অয়মহং ভো!'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তেজঃপুঞ্জকান্তি এক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। একালের মানুষ নয় তাহা বেশবাস দেখিয়া বোঝা যায়। ক্ষৌরিত মাথাটির মাঝখানে পরিপুষ্ট শিখা, স্কন্ধে মুঞ্জোপবীত, গলায় শুভ্র দুকূলের উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্র; মুখখানি স্মিত-হাস্যোজ্জ্বল, চক্ষুদুটি ভ্রমরের ন্যায় মেয়েদের মুখের উপর পরিভ্রমণ করিতেছে।

মেয়েরা পুরুষকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যেন সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল, তারপর এক ঝাঁক প্রজাপতির মত ছুটিয়া পলাইল।

ঘর শূন্য হইয়া গেলে আমি যুক্তকরে পুরুষকে বলিলাম—'আসুন কবিবর, আপনার চরণস্পর্শে আমার স্তম্ভ পবিত্র হোল।'

কালিদাস উপবিষ্ট হইয়া এদিক ওদিক চাহিলেন, বলিলেন,—'খাসা স্তম্ভটি। আমার যদি এমনি একটি স্তম্ভ থাকত, আরও

অনেক লিখতে পারতাম। রাজসভার হট্টগোলে কি লেখা যায় ?'

বলিলাম,—'কবি, সাতটি গ্রন্থ লিখে আপনি সপ্তলোক জয় করেছেন। কী প্রয়োজন ?'

কবি একটু বিমনা হইয়া বলিলেন, 'তা যেন হল। কিন্তু মেয়েগুলো আমাকে দেখে পালালো কেন বল দেখি।'

অপ্রতিভভাবে কাশিয়া বলিলাম,—'হেঁ হেঁ—কি জানেন, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে আপনার একটু—ইয়ে—দুর্নাম আছে কিনা —তাই—'

পরম বিস্ময়ভরে কবি বলিলেন,—'তাই নাকি ! কিন্তু সেকালে তো কোনো দুর্নাম ছিল না। উজ্জয়িনীর প্রধানা নগরনটী প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে আমার ভাব-সাব ছিল, মালিনীকেও ভালবাসতাম ; এমন কি রানী ভানুমতীও আমার প্রতি প্রীতিমতী ছিলেন। কিন্তু সেজন্যে আমাকে দুর্নাম তো কেউ দেয়নি। আর তরুণীরাও আমাকে দেখে ছুটে পালাত না, বরং ছুটে এসে ঘিরে ধরত।'

কবিকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া আমি বলিলাম,—'একালের মেয়েরা আগের মত সাহসিনী নয়, ভারতবর্ষে যবন আক্রমণের পর থেকে আর্যনারীরা বড়ই ভীরু হয়ে পড়েছে। উপরন্তু আপনার নামে নানারকম গল্প শুনেছে—'

কবিবর উত্তপ্ত হইয়া বলিলেন,—'এ তোমাদের কাজ। তোমরাই বানিয়ে বানিয়ে আমার নামে মিথ্যে গল্প রচনা করেছ। তাই সুন্দর সুন্দর মেয়েরা আমাকে দেখে পালিয়ে যায়।'

বলিলাম,—'তা কি করব ? আপনি নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও লিখে যাননি, কাজেই আমাদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখতে হয়। আপনার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের যে অন্ত নেই কবি।'

কবি একটু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন,—'আমার জীবনের সব তথ্য জানা থাকলে কি এত কৌতূহল থাকত? কিন্তু ওকথা যাক। তুমি এ কি কাণ্ড করেছ?'

'কী কাণ্ড করেছি?'

'আমাকে নিয়ে দুটো গল্প বানিয়েছ। একটাতে পরম সুশীলা কুন্তল-রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ। অন্যটিতে আমার স্ত্রীকে করেছ এক দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ। দুটোই কি করে সম্ভব হয়?'

'কেন সম্ভব হবে না? কুন্তলকুমারী কালক্রমে দজ্জাল খাণ্ডার হয়ে উঠতে পারেন। এমন তো কতই হয়।'

কবি মিটিমিটি হাসিয়া বলিলেন,—'তোমার অভিসন্ধি বুঝেছি। অন্ধকারে দুটো ঢিল ছুঁড়েছ, যেটা লেগে যায়। কেমন?'

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম,—'তাহলে একটা ঢিল লেগেছে!'

কালিদাস মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'উঁহু, এই ফাঁকে সত্য কথাটা জেনে নিতে চাও। সেটি হচ্ছে না। আমি উঠলাম।' বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন।

আমি করজোড়ে বলিলাম,—'কবিবর, আর একটু বসুন। আপনি কেন এই দীনের কুলায়ে শুভাগমন করেছেন তা তো বললেন না। আপনিও কি জানতে চান আমি আপনাকে ভালবাসি কিনা? তাহলে মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি আপনাকে ভালবাসি, আমার যতটুকু ভালবাসার ক্ষমতা আছে সব দিয়ে আপনাকে ভালবাসি।'

কবি বলিলেন,—'কথাটা পরিষ্কার হল না। আমাকে ভালবাস, না আমার কাব্যকে ভালবাস?'

বলিলাম,—'আপনার কাব্য আর আপনি কি আলাদা? আপনাকে আপনার কাব্যের মধ্যেই পেয়েছি, আর তো কোথাও পাই নি। আমি আপনার যে চরিত্র গড়েছি সে তো আপনার ভাবমূর্তি, আপনার কাব্যের মধ্যেই সে-মূর্তি পেয়েছি। —কবি, বলুন আমার আঁকা সে-মূর্তি যথার্থই কিনা।'

কবি বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'আর একটু হলেই বলে ফেলেছিলাম। তুমি বড় ধূর্ত। নাঃ, আর নয়, এবার আমি উঠি।'

কিন্তু তাঁহার ওঠা হইল না, দ্বারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ বক্সী দাঁড়াইয়া আছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সে আসিয়া আমার সম্মুখে মহাকবির পাশে বসিল। তাঁহার প্রতি একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—'অনেক পুরনো লোক মনে হচ্ছে। শীলভদ্র নাকি? না, গলায় পৈতে আছে, বৌদ্ধ নয়। দীপঙ্করও নয়। তবে কি মহাকবি কালিদাস?'

কবিবর ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন পরিচয় করাইয়া দিলাম। বলিলাম,—'ব্যোমকেশ বক্সী একজন সত্যান্বেষী। পরের গুপ্তকথা খুঁচিয়ে বার করা ওর কাজ। কবিবর, আপনার জীবনে যদি কোনো গুপ্তকথা থাকে, সাবধান থাকবেন।'

কবি তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—'আরে সর্বনাশ! আমার জীবনটাই তো একটা গুপ্তকথা। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমি চললাম। এ রকম লোক তোমার কাছে আসে জানলে—। আচ্ছা, স্বস্তি স্বস্তি।'

আমি দ্বার পর্যন্ত কবিকে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিলাম,—'নমস্কার কবি। পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে।'

কবি দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া অদৃশ্য হইলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশকে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার সহিত আমার পরিচয় প্রায় ত্রিশ বছর। সে বিবাহ করিবার পর ষোল-সতরো বছর তাহাকে কাছে ঘেঁষিতে দিই নাই, তারপর আবার আসিয়া জুটিয়াছে। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। এত বুদ্ধি ভাল নয়।

প্রশ্ন করিলাম—'তোমার ল্যাংবোট কোথায়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অজিত? সে আপনার ওপর অভিমান করেছে, তাই এল না।'

'অভিমান কিসের?'

'আপনি তাকে ক্যাবলা বানিয়েছেন তাই। বেচারা সাহিত্যিক মহলে কলকে পায় না, সবাই তাকে দেখে হাসে।'

'হুঁ। তোমাকে দেখে কেউ হাসে না এই আশ্চর্য। তোমরা দুজনেই সমান। একজন বুদ্ধির জাহাজ, অন্যটি ক্যাবলা। দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

ব্যোমকেশ সিগারেটে লম্বা টান দিয়া বাঁকা হাসিল, বলিল,—'আমাদের তাহলে আপনি ভালবাসেন না? মানে, আমরা আপনার প্রিয়-চরিত্র নই।'

দৃঢ়স্বরে বলিলাম,—'না, তোমরা আমার প্রিয়-চরিত্র নও। এ কথাটা ভাল করে বুঝে নাও।'

ব্যোমকেশ নির্বিকার স্বরে বলিল,—'আমি আগে থেকেই জানি। এবং আপনার প্রিয়-চরিত্র কে তাও জানি।'

চকিত হইয়া বলিলাম,—'তাই নাকি! কে আমার প্রিয়-চরিত্র? কার কথা বলছ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যে আপনার প্রত্যেক লেখার মধ্যে

অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, যাকে বাদ দিয়ে আপনি এক ছত্রও লিখতে পারেন না, তার কথা বলছি।'

'কিন্তু লোকটা কে? নাম কি?'

'শুনবেন?' ব্যোমকেশ আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি একটা নাম বলিল।

চমকিয়া উঠিলাম। মনের অগোচর পাপ নাই, ব্যোমকেশ ঠিক ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ মুখ-ব্যাদান করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—'তুমি কি করে জানলে?'

ব্যোমকেশ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল,—'আপনার প্রশ্নটা অজিতের প্রশ্নের মত শোনাচ্ছে।'

আত্মসংবরণ করিয়া তাহার পানে কটমট তাকাইলাম, দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম,—'তুমি এবার বিদেয় হও।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'ধরা পড়ে গিয়ে আপনার রাগ হয়েছে দেখছি। আচ্ছা আজ চলি। আর একদিন আসব।'

সে চলিয়া গেলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আজ আর কাহাকেও ঢুকিতে দিব না। অনর্থক সময় নষ্ট।

প্রদীপটিকে কাছে টানিয়া খাতা পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিলাম। পূজা আসিয়া পড়িল। পূজার সময় একটা ব্যোমকেশের রহস্য-কাহিনী না লিখিলেই নয়।

সেই আমি

ষাট বছর বয়সে কবিতা লিখিয়াছি। আধ্যাত্মিক কবিতা নয়, রসের কবিতা।

আমার কবিতা কেহ পড়ে না, পত্রিকা-সম্পাদকেরা ছাপিতে চান না; তাই ইদানীং কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। শুধু গদ্য লিখি। তবে আজ কবিতা লিখিলাম কেন, তাহার একটা কৈফিয়ত প্রয়োজন।

কাল সকালে চোখে চশমা আঁটিয়া লিখিতে বসিয়াছি, দ্বারের সম্মুখে একটি ছায়া পড়িল। চোখ তুলিয়া দেখিলাম, কেহ একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখ-চোখ দেখিতে পাইলাম না, কাপড়ের রং দেখিয়া বুঝিলাম, স্ত্রী-জাতীয় জীব।

আমার দুটি চশমা; একটি দেখার জন্য, অন্যটি লেখার জন্য। যখন লিখিতে বসি, তখন বহির্জগৎ আবছায়া হইয়া যায়। আমি লেখার চশমা খুলিয়া দেখার চশমা পরিধান করিলাম, তারপর চোখ তুলিয়া দ্বারবর্তিনীর পানে অপলকে চাহিয়া রহিলাম।

সতরো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে। বর্ণনার প্রয়োজন নাই; সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী সুনয়না মেয়ে, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাবভঙ্গীতে সহজ স্বচ্ছন্দতা। কিন্তু আমি যে তাহার পানে নিষ্পলক চাহিয়া ছিলাম, তাহার কারণ তাহার স্নিগ্ধ-মধুর যৌবনশ্রী নয়, অন্য কারণ ছিল।

সে বলিল, 'আসতে পারি?'

বলিলাম, 'এস।'

সে আমার টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি নাকের

উপর চশমাটা ভালভাবে বসাইয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে দেখিলাম। শেষে বলিলাম, 'কি দরকার, বল তো?'

সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আপনি লিখতে বসেছিলেন, আমি এসে বিরক্ত করলুম!' লেখার খাতা সরাইয়া রাখিয়া বলিলাম, 'তা হোক। তোমার নাম কি?'

সে বলিল, 'আমার নাম মল্লী—মল্লী মিত্র। আমি মা-বাবার সঙ্গে দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি, এখানে তিন চার দিন আমরা থাকব। আপনি এখানে থাকেন জানি, তাই কলকাতা থেকে বেরুবার আগে আপনার ঠিকানা যোগাড় করেছিলুম।'

মল্লীকে একটু পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম, 'বোসো। তুমি কি বেথুন কলেজে পড়ো? আমি একবার বেথুন কলেজে গিয়েছিলাম, অনেক ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভাবছি, তুমি হয়তো তাদেরই একজন।'

মল্লী বসিল না; বলিল, 'না, আমি গোখেলেতে পড়ি। আপনি আমাকে আগে দেখেন নি।'

আমি আবার খানিকক্ষণ তাহার মুখখানি দেখিয়া বলিলাম, 'ও কথা যাক। তুমি আমার মতন একটা বুড়োকে দেখবার জন্যে নিশ্চয় আসো নি। কি চাই, বলো।'

তাহার হাতে একটি শ্রীনিকেতনের চামড়ার ব্যাগ ছিল, সে তাহার ভিতর হইতে একটি মরক্কো-বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আমার সামনে রাখিল; বলিল, 'আমার অটোগ্রাফের খাতায় আপনার হাতের লেখা নেই।'

খাতাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, অনেক মহাজনের করাঙ্ক তাহাতে আছে; কেহ উপদেশ দিয়াছেন, কেহ শুধুই দস্তখত মারিয়াছেন।

আমি কলম লইয়া নিজের নাম লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, মল্লী বলিল, 'একটু কিছু লিখে দেবেন না ?'

কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, শেষে বলিলাম, 'তুমি কাল বিকেলবেলা আর একবার আসতে পারবে ?'

মল্লী বলিল, 'আসব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। আমি তোমার জন্যে কিছু লিখে রাখব। আর দেখ, কাল যখন আসবে, তোমার খোঁপায় বেলফুলের বেণী প'রে এসো। বেণী কাকে বলে জানো ? এদেশে খোঁপায় পরার মালাকে বেণী বলে।'

সে ক্ষণেক অবাক্ হইয়া আমার পানে চাহিল। হয়তো ভাবিল, লেখকত্ব ও পাগলামির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। তারপর একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

তাহার খাতাটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেক চিন্তা করিলাম, অনেক হিসাব-নিকাশ করিলাম। আঠারোতে আঠারো যোগ দিলে ছত্রিশ হয়, তাহাতে আঠারো যোগ দিলে হয় চুয়ান্ন। ঠিক ধরিয়াছি। মল্লী···বাসন্তী··মিত্র···বসু···গোত্র গোত্রান্তর··· দিদিমা···ঠাকুরমা···

তারপর কবিতা লিখিলাম—

তোমারে হেরিয়াছিনু একদিন কুঙ্কুম-অরুণিত সন্ধ্যায়
স্মরণ-সরণি ধরি' আজিও সেদিন পানে মন ধায়।—
তোমার নয়নে ছিল পল্লব-ছায়া-করা স্বপ্ন-মদির
সুখ-তন্দ্রা
কবরী ঘেরিয়া সখি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মল্লীমুকুল
মধুগন্ধা···

কিন্তু আর বেশী কবিতা করিব না, পাঠক-পাঠিকারা চটিয়া যাইতে পারেন।

আজ সূর্যাস্তের সময় মল্লী আসিল। তাহার কবরীতে মল্লী-মুকুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বলিলাম, 'বোসো।'

মল্লী বসিল, উৎসুক চোখে আমার পানে চাহিল।

বলিলাম, 'এই নাও তোমার খাতা। কবিতা লিখে দিয়েছি। এখন প'ড়ো না, ফিরে গিয়ে প'ড়ো।'

মল্লী কবিতাটি বহু যত্নে ব্যাগের মধ্যে রাখিল। তখন আমি বলিলাম, 'তুমি কাল বলেছিলে, আমি তোমাকে আগে দেখি নি। কথাটা ঠিক নয়। আমি তোমাকে আগে দেখেছি।'

মল্লী বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে বলিল, 'দেখেছেন! কবে? কোথায়?'

বলিলাম, 'সেই যে—নির্জন বালুচরের ওপর দিয়ে ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছিল, পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের হোলীখেলা চলছিল—সেইখানে আমি তোমায় দেখেছিলাম। তোমার মনে পড়ছে না?'

মল্লী স্বপ্নাতুর চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'না, আমার তো মনে পড়ছে না। কবে—কতদিন আগে—?'

মনে মনে আগেই হিসাব করিয়া রাখিয়াছিলাম, তবু হিসাবের ভান করিয়া বলিলাম, 'চল্লিশ বছর আগে।'

মল্লীর চোখ-দুটি বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল, তারপর সে কলস্বরে হাসিয়া উঠিল, 'চল্লিশ বছর আগে! কিন্তু আমার বয়স যে মোটে আঠারো বছর।'

বলিলাম, 'তা হবে। চল্লিশ বছর আগেও তোমার বয়স ছিল আঠারো। তখন তোমার নাম ছিল বাসন্তী।'

সে উচ্চকিত হইয়া প্রতিধ্বনি করিল, 'বাসন্তী! কিন্তু বাসন্তী যে আমার'—

'দিদিমার নাম।'

মল্লী কিছুক্ষণ অধরোষ্ঠ বিভক্ত করিয়া চাহিয়া রহিল, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি ক'রে?'

প্রশ্নের উত্তর দিলাম না, বলিলাম,—'আমার কাছে তোমার নাম মল্লী নয়, বাসন্তী। কাল তোমাকে দে'খেই চিনতে পেরেছিলাম।'

'আপনি আমার দিদিকে চিনতেন!'

অতঃপর তাহাকে অনেক কথা বলিলাম যাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কাহিনীতে প্রজনন-বিজ্ঞান বাঞ্ছনীয় নয়। শেষে প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার দিদি ভাল আছেন?'

মল্লী ছলছল চক্ষে বলিল, 'দু'বছর আগে দিদি মারা গেছেন।'

অনেকক্ষণ পরে কথা কহিলাম। বলিলাম, 'না। তোমার দিদি বেঁচে আছেন, চিরদিন বেঁচে থাকবেন। আমিও চিরদিন বেঁচে থাকব। তোমার নাতনীর বয়স যখন আঠারো বছর হবে তখনও আমরা বেঁচে থাকব। কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।—আচ্ছা, আজ তুমি এস। আবার দেখা হবে।'

দেখার চশমা খুলিয়া লেখার চশমা পরিয়া ফেলিলাম। গল্প লিখিতে হইবে। কবিতার দিন গিয়াছে।

স্ত্রী-ভাগ্য

ধীরাজের বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন একটা হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ধীরাজ আমার ছেলেবেলার বন্ধু; তারপর বড় হইয়া কলিকাতার একই মেসে একই ঘরে বাস করিয়াছি, এবং একই শেয়ার-দালালের অফিসে কেরানীগিরি করিয়াছি। সুতরাং তাহার হৃদয়-মনের একটা স্পষ্ট চিত্র আমার মনে থাকা উচিত। কিন্তু এখন মনে হয় তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গোপন চোর-কুঠরি ছিল; সেখানে সে কী রাখিত আমি কোনোদিন জানিতে পারি নাই।

অথচ সে চাপা প্রকৃতির লোক ছিল না। তাহার ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারা দেখিলে ও ধারালো মুখের শাণিত কথাবার্তা শুনিলে মনে হইত সে বিজ্ঞানের ছাত্র; তাহাকে কেরানীশ্রেণীর মানুষ বলিয়া একেবারেই মনে হইত না। সাধারণ মানুষ যে-সকল প্রসঙ্গ সংকোচবশে এড়াইয়া যায় সে তাহা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিত। তখন আমরা দুজনেই অবিবাহিত, সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীন এবং দরিদ্র কেরানী। আমি এখনো দরিদ্র কেরানীই রহিয়া গিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের জীবনে এই কয়বছরে এত উত্থানপতন ঘটিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়।

ধীরাজের বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু তাহার দেহটা ছিল ঠিক সেই পরিমাণে অলস ও নিষ্কর্মা। ছুটির দিনে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিত; ঘরে আড্ডা বসিলে সে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই আড্ডায় যোগ দিত। অফিসে না গেলে চাকরি থাকিবে না তাই অফিসে যাইত। তাও অফিসের কাজ এমন বেগার-ঠেলা ভাবে

করিত যে আমি তাহার অর্ধেক কাজ করিয়া না দিলে চাকরি থাকিত কিনা সন্দেহ।

ধীরাজের বিবাহ একটি বিচিত্র ঘটনা। একটা ছুটির দিনে সকালবেলা আমি বাজারে গিয়াছিলাম, তেল সাবান টুথ-পাউডার প্রভৃতি কিনিবার ছিল। বেলা দশটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ধীরাজ শয্যাত্যাগ করিয়াছে, দাড়ি কামাইয়াছে, কাপড়-চোপড় পরিয়া তৈরি হইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল,—'চল্, এখনি বেরুতে হবে।'

আমি হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম—'তোর আজ হল কি! কোথায় যেতে হবে?'

সে বলিল,—'পরে শুনিস্। এখন চট্ করে ভালো কাপড়-চোপড় প'রে তৈরি হয়ে নে।

পনরো মিনিটের মধ্যে বাহির হইলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে সেটা এবার জানিতে পারি কি?'

ধীরাজ বলিল,—'আমি যাচ্ছি বিয়ে করতে। সিভিল ম্যারিজ্। তুই আমার সাক্ষী।'

রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলাম—'বিয়ে! কার সঙ্গে? কোথায়?'

সে আমার বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল—'বেশী দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।'

'কিন্তু পাত্রী কে? কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে জানি না। পাত্রীকে জানি; নাম ঊষা পাঠক। স্বাধীন মেয়ে, ইন্সিওরেন্সের দালালি করে।'

আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

'কে দালালি করে ?'

'পাত্রী।'

অতঃপর আর কিছু বলিবার রহিল না। বীমার দালালি করে এমন মেয়ে নিশ্চয় আছে, নচেৎ ধীরাজ তাহাকে বিবাহ করিবে কেমন করিয়া ? কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিলাম,—'বিয়ের কথা আগে বলিস্‌নি কেন ?'

সে বলিল,—'কী এমন মহামারী ব্যাপার যে ঢাক পিটোতে হবে ?'

নানা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন প্রবলতর হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোথায় তোদের দেখাশুনো হল তাও জানি না। তা—প্রেম নাকি ? প্রেমে পড়েছিস্‌ ?'

ধীরাজ প্রশ্নের উত্তর দিল না, ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল।

ইতিমধ্যে আমরা একটি তিনতলা বাড়ীর সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম, সুতরাং আর প্রশ্ন করাও হইল না। ধীরাজ আমাকে লইয়া তিনতলা বাড়ীর ডগায় উঠিল।

ছিমছাম পরিচ্ছন্ন একটি ফ্ল্যাট। যে যুবতীটি ফ্ল্যাটের দরজা খুলিয়া দিল সেও বেশ ছিমছাম। সুন্দরী নয়, মুখখানা টিয়াপাখীর মতো ; কিন্তু চোখে আছে চটুল কটাক্ষ, পরিপক্ব অধরে আছে খুনখারাবী রঙের হাসি। বেশবাস পরিবার ভঙ্গীতে দেহকে আচ্ছাদন করার চেয়ে উন্মোচন করার চেষ্টাই বেশী।

ধীরাজ পরিচয় করাইয়া দিল,—'আমার বন্ধু মানিক ঘোষ। ঊষা পাঠক—আমার—'

ঊষা পাঠক আমার পানে চোখ বাঁকাইয়া হাসিল।

সুসজ্জিত ঘরে গিয়া বসিলাম। ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় ধীরাজের ভাবী স্ত্রীর পয়সা আছে, বীমার দালালি করিয়া নিশ্চয় অনেক টাকা রোজগার করে।

ঘরে আরও তুটি মানুষ আছে। বিলাতী পোশাক-পরা ফিটফাট তুটি যুবক। একজন বাঙালী, অন্যটি মাড়োয়ারী। ইহারা পাত্রীর বন্ধু, বিবাহে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই বিবাহের পুরোহিত, অর্থাৎ রেজিস্ট্রার মহাশয় চাপরাসীর হাতে বিরাট খাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্র-পাত্রীকে তু'একটি সওয়াল-জবাব, খাতায় নাম লেখা, সাক্ষীদের সহি-দস্তখত। ব্যস্, বিবাহ হইয়া গেল। ঢাক-ঢোল নাই, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর কামড়া-কামড়ি নাই, উলু সাতপাক কুশণ্ডিকা নাই, অথচ পাকা বিবাহ। রেজিস্ট্রার মহাশয় দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। খাসা বিবাহ।

অতঃপর আমরা সাক্ষীরা জলযোগপূর্বক প্রস্থান করিলাম। নববধূ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া খুনখারাবি রঙের হাসি হাসিল। ধীরাজ বলিল,—'আচ্ছা, কাল অফিসে দেখা হবে।'

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মনটা খারাপ হইয়া গেল। একে তো বিবাহের পদ্ধতিটা নিতান্তই অনভ্যস্ত, তার ওপর উষা পাঠক মেয়েটাকেও ভালো লাগিল না। তাহার বন্ধু তুটিকে ভালো লাগিল না। তাহাদের চালচলন ভাবভঙ্গী খুবই পরিমার্জিত, তবু ভালো লাগিল না।

ছুটির দিনে বাসার অন্য অধিবাসীরা সকলেই বাসায় ছিলেন, পাশের ঘরে আড্ডা বসিয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিলে তুই তিন জন আমাদের ঘরে আসিলেন। একজন বলিলেন,—কি ব্যাপার বলুন দেখি! ধীরাজবাবু আজ তুপুরের আগেই বিছানা ছেড়ে কোথায় গেলেন?'

মনের তুঃখে ধীরাজের বিবাহের কথা বলিলাম। শুনিয়া সকলে চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন—'এ কি রকম কথা! ধীরাজবাবু বিয়ে

করলেন অথচ আমাদের একবার জানালেন না! না হয় বরযাত্রী না-ই যেতাম, রসগোল্লা না-ই খেতাম'—ইত্যাদি।

সুশীলবাবু নামক এক ভদ্রলোক বলিলেন,—'বোধ হয় অসবর্ণ বিবাহ। পাত্রীর নাম কি?'

বলিলাম,—'উষা পাঠক।'

সুশীলবাবুর ভ্রূযুগল গুণছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিল,—'উষা পাঠক! বলেন কি মশাই! সে যে নামজাদা মেয়ে!'

'নামজাদা মেয়ে! আপনি তাকে চেনেন নাকি?'

সুশীলবাবু বলিলেন,—'পরিচয় নেই। তবে কীর্তিকলাপ জানা আছে। ছি ছি ছি, ধীরাজবাবু শেষে উষা পাঠককে বিয়ে করলেন! এইজন্যই বুঝি কাউকে খবর দেন নি।'

'উষা পাঠকের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?'

সুশীলবাবু অরুচিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—'অনেক কিছুই জানি; শুধু আমি নয়, আরো অনেকে জানে। উষা পাঠক যখন কলেজে পড়ত তখন একটা ছেলের সঙ্গে নটঘট করেছিল, পরে জানাজানি হয়ে যায়; কলেজ থেকে দু'জনকেই তাড়িয়ে দেয়। তারপর উষা বীমার দালালি আরম্ভ করে। বীমার দালালিটা ছুতো, আসলে বড়মানুষের ছেলেদের মাথা খাওয়াই ওর পেশা।'

সুশীলবাবুরা চলিয়া যাইবার পর গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। ধীরাজ কি জানিয়া-শুনিয়া একটা নষ্ট-মেয়েকে বিবাহ করিল? কিন্তু কেন? এই লইয়া মেসে ঢিঢিক্কার পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ধীরাজ আসিল না। মেসেও ফিরিল না। তারপর মাস-দুয়েক আর তাহার দেখা নাই। তাহার কাপড়-চোপড় বাক্স-বিছানা সবই বাসায় পড়িয়া আছে। তাহার চরিত্র যতদূর

ঘরে আরও দুটি মানুষ আছে। বিলাতী পোশাক-পরা ফিটফাট দুটি যুবক। একজন বাঙালী, অন্যটি মাড়োয়ারী। ইহারা পাত্রীর বন্ধু, বিবাহে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই বিবাহের পুরোহিত, অর্থাৎ রেজিস্ট্রার মহাশয় চাপরাসীর হাতে বিরাট খাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্র-পাত্রীকে দু'একটি সওয়াল-জবাব, খাতায় নাম লেখা, সাক্ষীদের সহি-দস্তখত। ব্যস্, বিবাহ হইয়া গেল। ঢাক-ঢোল নাই, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর কামড়া-কামড়ি নাই, উলু সাতপাক কুশণ্ডিকা নাই, অথচ পাকা বিবাহ। রেজিস্ট্রার মহাশয় দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। খাসা বিবাহ।

অতঃপর আমরা সাক্ষীরা জলযোগপূর্বক প্রস্থান করিলাম। নববধূ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া খুনখারাবি রঙের হাসি হাসিল। ধীরাজ বলিল,—'আচ্ছা, কাল অফিসে দেখা হবে।'

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মনটা খারাপ হইয়া গেল। একে তো বিবাহের পদ্ধতিটা নিতান্তই অনভ্যস্ত, তার ওপর উষা পাঠক মেয়েটাকেও ভালো লাগিল না। তাহার বন্ধু দুটিকে ভালো লাগিল না। তাহাদের চালচলন ভাবভঙ্গী খুবই পরিমার্জিত, তবু ভালো লাগিল না।

ছুটির দিনে বাসার অন্য অধিবাসীরা সকলেই বাসায় ছিলেন, পাশের ঘরে আড্ডা বসিয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিলে দুই তিন জন আমাদের ঘরে আসিলেন। একজন বলিলেন,—কি ব্যাপার বলুন দেখি! ধীরাজবাবু আজ দুপুরের আগেই বিছানা ছেড়ে কোথায় গেলেন?'

মনের দুঃখে ধীরাজের বিবাহের কথা বলিলাম। শুনিয়া সকলে চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন—'এ কি রকম কথা! ধীরাজবাবু বিয়ে

করলেন অথচ আমাদের একবার জানালেন না! না হয় বরযাত্রী না-ই যেতাম, রসগোল্লা না-ই খেতাম'—ইত্যাদি।

সুশীলবাবু নামক এক ভদ্রলোক বলিলেন,—'বোধ হয় অসবর্ণ বিবাহ। পাত্রীর নাম কি?'

বলিলাম,—'ঊষা পাঠক।'

সুশীলবাবুর ভ্রূযুগল গুণছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিল,—'ঊষা পাঠক! বলেন কি মশাই! সে যে নামজাদা মেয়ে!'

'নামজাদা মেয়ে! আপনি তাকে চেনেন নাকি?'

সুশীলবাবু বলিলেন,—'পরিচয় নেই। তবে কীর্তিকলাপ জানা আছে। ছি ছি ছি, ধীরাজবাবু শেষে ঊষা পাঠককে বিয়ে করলেন! এইজন্যই বুঝি কাউকে খবর দেন নি।'

'ঊষা পাঠকের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?'

সুশীলবাবু অরুচিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—'অনেক কিছুই জানি; শুধু আমি নয়, আরো অনেকে জানে। ঊষা পাঠক যখন কলেজে পড়ত তখন একটা ছেলের সঙ্গে নটঘট করেছিল, পরে জানাজানি হয়ে যায়; কলেজ থেকে দু'জনকেই তাড়িয়ে দেয়। তারপর ঊষা বীমার দালালি আরম্ভ করে। বীমার দালালিটা ছুতো, আসলে বড়মানুষের ছেলেদের মাথা খাওয়াই ওর পেশা।'

সুশীলবাবুরা চলিয়া যাইবার পর গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। ধীরাজ কি জানিয়া-শুনিয়া একটা নষ্ট-মেয়েকে বিবাহ করিল? কিন্তু কেন? এই লইয়া মেসে ঢিঢিক্কার পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ধীরাজ আসিল না। মেসেও ফিরিল না। তারপর মাস-দুয়েক আর তাহার দেখা নাই। তাহার কাপড়-চোপড় বাক্স-বিছানা সবই বাসায় পড়িয়া আছে। তাহার চরিত্র যতদূর

জানি তাহা হইতে অনুমান করিলাম সে নব-পরিণীতা স্ত্রীর বাসায় বিছানায় শুইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছে। রোজগেরে বৌ যখন পাইয়াছে তখন আর কাজ করিবে কেন? বলা বাহুল্য, চাকরি রহিল না।

আমি ইচ্ছা করিলে তাহার স্ত্রীর বাসায় গিয়া খোঁজখবর লইতে পারিতাম। কিন্তু তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার পর আর সেদিকে যাইবার উৎসাহ ছিল না। যাক্ গে, মরুক গে, আমার কী,—এইরূপ মনোভাব লইয়া বসিয়া ছিলাম। বাসায় আমার ঘরে ধীরাজের বদলে অন্য লোক আসিয়াছিল।

একদিন বিকালে অফিস হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে পা দিয়াছি, একটি ঝকঝকে নূতন মোটর আসিয়া ফুটপাথ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছে ধীরাজ। তাহার চেহারাও মোটরের মতোই ঝকঝক করিতেছে; পরিধানে পুরু সিল্কের প্যাণ্টলুন ও মিহি সিল্কের বুশ-শার্ট, মাথার চক্‌চকে চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। গাড়ী চালাইতেছে একজন ছোকরা শিখ। দেখিয়া শুনিয়া আমি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম।

ধীরাজ গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল,—'আয়, তোকে বাসায় পৌঁছে দিই।'

মনের আড়ষ্টতা দূর হইবার পূর্বেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

ধীরাজ আমার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল, সোনার সিগারেট-কেস আমার সামনে খুলিয়া ধরিয়া বলিল,—'তুই কি ঘাব্‌ড়ে গেলি নাকি?'

দামী সিগারেট। আমি যে-সিগারেট খাই তাহার এক প্যাকেটের চেয়েও এই একটা সিগারেটের দাম বেশী। ধীরাজ

লাইটার জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া দিল। আমি নীরবে দুই-তিন টান দিয়া বলিলাম,—'কার গাড়ী ?'

ধীরাজ ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—'আমার গাড়ী। আর কার ?'

প্রশ্ন করিলাম,—'টাকা কোথায় পেলি ?'

ধীরাজের চক্ষু উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—'টাকা—রোজগার করেছি। পাঁচ হপ্তায় সাঁইত্রিশ হাজার টাকা রোজগার করেছি। বিশ্বাস হয় ?'

'বিশ্বাস করা শক্ত। কিসে এত টাকা রোজগার করলি ?'

'শেয়ার-মার্কেটে। এতদিন মিছেই কেরানীগিরি করে মরেছি। যদি গোড়া থেকে ফাট্‌কা খেলতাম—এতদিনে লাখপতি হয়ে যেতাম।'

তাহার মুখচোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, হঠাৎ অনেক টাকা রোজগার করার উত্তেজনা সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মনে মনে একটু ঈর্ষা যে অনুভব না করিলাম এমন নয়। বলিলাম,—'শেয়ার-মার্কেটে জুয়া খেলতে হলে মূলধন দরকার। তুই মূলধন পেলি কোথায় ?'

ধীরাজ তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। বিবাহের পর তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল,—'কেরানীগিরিতে কি পয়সা আছে ? তুমি শেয়ার-মার্কেটে যাতায়াত আরম্ভ করো।'

এই বলিয়া তাহাকে দু'হাজার টাকা দিয়াছিল। ধীরাজ শেয়ার-দালালের অফিসে চাকরি করিয়া শেয়ার বেচাকেনা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানিত, কিন্তু নিজে কখনো শেয়ারের খেলা খেলে নাই। সে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইল। কিন্তু এমনি তাহার জোর বরাত, প্রথম হইতেই সে লাভ করিতে আরম্ভ করিল। বৌ তাহাকে শেয়ার সম্বন্ধে 'টিপ' সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। ক্রমে এমন দাঁড়াইল,

সে যে-শেয়ার কেনে সেই শেয়ারের দাম চড়চড় করিয়া চড়িয়া যায়। গত পাঁচ হপ্তায় সে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে; তারপর মোটর কিনিয়াছে, দেড়শো টাকা মাহিনা দিয়া ড্রাইভার রাখিয়াছে। এখন আরো কিছু টাকা হস্তগত করিতে পারিলেই বালিগঞ্জে বাড়ী কিনিবে।

কাহিনী শেষ করিয়া ধীরাজ বলিল,—'একেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং।'

মনে মনে ভাবিলাম, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং-ও বটে। মুখে বলিলাম,—'খাসা বৌ যোগাড় করেছিস। কথায় বলে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। তা তুই তো আর আমাদের পচা মেসে ফিরে আসবি না; তোর জিনিস-পত্র আমার কাছে পড়ে রয়েছে, সেগুলো নিয়ে যা।'

ধীরাজ তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—'ও আর এখন কী হবে, তোর কাছেই থাক। পরে দেখা যাবে।'

গাড়ী আসিয়া মেসের সামনে থামিল। আমি নামিবার উপক্রম করিতেছি, ধীরাজ বলিল,—'তুই একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি নেনা।'

ফিরিয়া বলিলাম,—'লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি!'

সে বলিল,—'হ্যাঁ। আমি পঞ্চাশ হাজারের নিয়েছি। তুই অন্তত দশ হাজারের নে। বিশ বছর পরে টাকা পাবি।'

বলিলাম,—'তা তো পাব, কিন্তু ততদিন খাব কি? যা মাইনে পাই, প্রিমিয়ম দিয়ে কিছু বাঁচবে কি?'

সে হাসিয়া বলিল,—'আচ্ছা, পাঁচ হাজারের নিস্। বেশী প্রিমিয়ম দিতে হবে না, আমার বৌ সব ঠিকঠাক করে দেবে। এক-দিন আসিস্ আমার বাসায়।'

আমি উত্তর দিলাম না, গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। গাড়ী

চলিয়া গেল। ধীরাজের কপাল খুলিয়াছে, কিন্তু আমার তো খোলে নাই। পেটে ভাত নাই—পাঁচ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স!

মেসের দোরগোড়ায় সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন,—'ব্যাপার কি! কার মোটরে চড়ে অফিস থেকে ফিরলেন?' তিনি পদব্রজে অফিস হইতে ফিরিতেছিলেন।

বলিলাম—'ধীরাজের মোটরে চড়ে।'

তাঁহার মুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সঙ্গে গভীর অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—'তাই নাকি! ধীরাজবাবু তাহলে এখন স্ত্রীর রোজগারে মোটর হাঁকাচ্ছেন?'

বলিলাম—'পুরুষস্য ভাগ্যং। কি করবেন, বলুন।'

সুশীলবাবু হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—'ঝাঁটা মারি অমন ভাগ্যের মুখে। ইজ্জতের বদলে মোটরগাড়ী! ছ্যাঃ।' তিনি ঘৃণাভরে পদদাপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম, ধীরাজের ববাহের সংবাদে তিনি যতটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহার ভাগ্যোদয়ের সংবাদে ততোধিক অসুখী হইয়াছেন। আমাদের মত সামান্য সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহাই বোধ হয় স্বাভাবিক। ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় দেখিবার জন্য আমাদের মন সর্বদাই উৎসুক; ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে মন খারাপ হইয়া যায়।

ধীরাজের ভাগ্যোন্নতির খবর মেসে প্রচারিত হইল। ধীরাজের অনুপস্থিতিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কারণ আমিই ছিলাম তাহার নিকটতম বন্ধু এবং সম্প্রতি তাহার মোটরগাড়ীতে চড়িয়াছি। আমি কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিচলিত হইলাম না, বরং ব্যঙ্গকারীদের দলে ভিড়িয়া গেলাম।

তাহাতে প্রতিপক্ষের অভাবে ব্যঙ্গবীরেরা একটু ভগ্নোদ্যম হইলেন বটে, কিন্তু পাঁয়তাড়া কষা একেবারে বন্ধ হইল না। বিশেষতঃ সুশীলবাবু উদ্যোগী পুরুষ, তিনি মাঝে মাঝে বাহির হইতে নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্তিমীয়মান জল্পনাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেন।

একদিন তিনি অফিস হইতে ফিরিয়া আমায় ঘরে আসিলেন, তক্তপোশের পাশে বসিয়া বলিলেন,—'আজ এক জবর খবর শুনলাম। উষা পাঠক, মানে ধীরাজবাবুর সহধর্মিণী এখন এক মাড়োয়ারী ছোকরার সঙ্গে ধর্মকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে বাড়ী থাকেন না, মাড়োয়ারীর সঙ্গে হোটেলে রাত্রি যাপন করেন। মাড়োয়ারী ছোকরাটি নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়, তার বাপ বুলিয়ন-মার্কেটের একজন দিক্‌পাল।'

বিবাহের সময় মাড়োয়ারী সাক্ষীকে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িল ; ইনি সম্ভবত তিনিই। কিন্তু সুশীলবাবুকে সে-কথা বলিয়া তাঁহার রসদ বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না, হাসিয়া বলিলাম,—'তবেই দেখুন। ধীরাজের বৌকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সবাই ভালবাসে। এমনকি মাড়োয়ারী পর্যন্ত।'

সুশীলবাবু বলিলেন,—'বলিহারি যাই! ছোঁড়াগুলো কি দেখে মজেছে তাও বুঝি না। দাঁত উঁচু, ঠোঁট মোটা—রূপের ধুচুনি!'

বলিলাম,—'রূপ দেখে কেউ মজে না, সুশীলবাবু। যা দেখে মজে তার খাস বিলিতী নাম হচ্ছে—'যৌন আবেদন।'

'ঝাঁটা মারি!' বলিয়া সুশীলবাবু উঠিয়া গেলেন।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। সুশীলবাবু মাঝে মাঝে বাহির হইতে খবর আনিয়া শোনান ; উষা পাঠক কোন্ পার্টিতে কত পেগ্ হুইস্কি টানিয়াছে, কাহার সহিত কতবার নাচিয়াছে,—এই ধরনের খবর। কিন্তু যতই দিন কাটিতে লাগিল, উষা-ধীরাজের কেচ্ছা

ততই বাসী হইয়া পড়িতে লাগিল। ধীরাজের ভাগ্যোদয়ও গা-সওয়া হইয়া গেল। ধীরাজ আমাকে তাহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিল, আমি অবশ্য যাই নাই; সেও আর আসে নাই। ধীরাজ আমাদের জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ভালোই হইয়াছে; ক্ষুদ্র কেরানী আমরা, বড়মানুষের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক!

অতঃপর প্রায় দুই বছর পরে আবার তাহার সহিত দেখা হইল। এবার আর মোটরগাড়ী নাই; আমার অফিসের সামনে একটা ল্যাম্প্‌পোস্টে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তাহার চেহারার সেই গিল্‌টি-করা চাকচিক্য আর নাই; মুখে একটা শুষ্ক বিবর্ণ ভাব।

আমাকে দেখিয়া ফ্যাকাসে হাসিল, ল্যাম্প্‌পোস্ট হইতে মেরুদণ্ড বিযুক্ত করিয়া বলিল,—'কি রে, কেমন আছিস্?'

আমি এদিক-ওদিক চাহিলাম,—'তোর মোটর কোথায়?'

'মোটর—' সে কথা পাল্‌টাইয়া বলিল,—'তুই বাসায় ফিরবি তো? বাসে যাবি, না হেঁটে?'

'হেঁটে। এখন বাসে চড়া অসাধ্য।'

'চল্ তবে, আমিও খানিকদূর তোর সঙ্গে হাঁটি।'

দুজনে পাশাপাশি চলিলাম। কথাবার্তা নাই। তাহার সহিত যেন মনের সংযোগ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শেষে সে নিজেই বলিল,—'মোটরটা বিক্রি কর ফেলতে হল। তিন মাস ধরে ক্রমাগত লোকসান চলেছে। বাজারের ধার শোধ করতে হবে তো।'

'নগদ টাকাও শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। নগদ বেশী ছিল না। বৌ—' বলিয়া ধীরাজ থামিয়া গেল।

চকিতে তাহার পানে চাহিলাম,—'বৌ কোথায় ?'

ধীরাজ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'বৌ এখানে নেই। ব্যাঙ্কে জয়েণ্ট-অ্যাকাউণ্টে টাকা ছিল, সে সব টাকা নিয়ে গেছে।'

'কোথায় গেছে ? কদ্দিন গেছে ?'

'মাস-তিনেক হল। বোধহয় বোম্বাই গেছে।'

'বোধহয় বোম্বাই গেছে—তার মানে ? তোকে কিছু বলে যায়নি ?'

ধীরাজ চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম বৌ টাকাকড়ি হস্তগত করিয়া পালাইয়াছে। হয়তো মাড়োয়ারী নাগর সঙ্গে আছে।

মনটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল; বলিলাম,—'কার সঙ্গে পালালো ? মাড়োয়ারীর সঙ্গে ?'

ধীরাজ আমার পানে একটা গুপ্ত কটাক্ষ হানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল; অস্পষ্টস্বরে বলিল,—'না, না, তুই ভুল শুনেছিস। মাড়োয়ারী নয়। বৌ ইন্সিওরেন্সের কাজে গেছে, বম্বেতে ওদের হেডঅফিস—'

'তুই এখন আছিস কোথায় ?'

'বৌ-এর বাসাতেই আছি। বছরখানেকের ভাড়া আগাম দেওয়া ছিল, এখনো ছ'মাসের মেয়াদ আছে।'

'তাই সেখানেই পড়ে আছিস্ ? তোর মতন বেহায়া দেখিনি। তুই যদি মানুষ হতিস্, বৌকে ডিভোর্স করতিস্।' বলিয়া আমি সবেগে পা চালাইলাম। রাগে আমার গা জ্বালা করিতেছিল।

ধীরাজ কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়িল না, সেও পা চালাইল। কিছুদূর চলিবার পর হঠাৎ বলিল,—'আমাকে পাঁচ-শো টাকা ধার দিতে পারিস ?'

প্রথমটা ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, তারপর হাসিয়া উঠিলাম,—'ও—এইজন্যে আমাকে মনে পড়েছে। টাকা ধার চাই। তা আমি

কত মাইনে পাই তা তো জানিস্। পাঁচ-শো টাকা জলে ফেলে দেবার মতন অবস্থা আমার নয়।'

সে বলিল,—'আমি বম্বে থেকে ফিরেই তোর টাকা শোধ করে দেব।'

'বুঝেছি, বম্বে যাওয়ার জন্যে টাকা দরকার। বৌকে ফিরিয়ে আনবি! তা—ভালো কথা। কিন্তু আমি টাকা ধার দিতে যাব কেন? আমার টাকা অত সস্তা নয়।'

আমি আরো জোরে পা চালাইলাম। এবার ধীরাজ আমার সঙ্গে তাল রাখিবার চেষ্টা করিল না, আস্তে আস্তে পিছাইয়া পড়িল। আমি কিছুদূর গিয়া ঘাড় ফিরাইলাম; সে ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেন কি চিন্তা করিতেছে। তারপর পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

বাসায় ফিরিতেই সুশীলবাবু ঘরে আসিয়া বসিলেন,—'আপনার বন্ধুপত্নীর নতুন খবর শুনেছেন?'

বলিলাম,—'শুনেছি, বম্বে পালিয়েছে। খবর কিন্তু নতুন নয়, তিন মাসের পুরনো।'

সুশীলবাবু একটু নিরাশ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—'তা যেন শুনেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে পালিয়েছে তা জানেন কি?'

'না। কার সঙ্গে?'

সুশীলবাবু বিজয়দর্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—'ওটাই তো আসল খবর। পালিয়েছে ধীরাজবাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে!'

'ড্রাইভার! মানে মোটর-ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঝুঁটি-বাঁধা শিখ ছোঁড়া ছিল, তার সঙ্গে ভেগেছে। গলায় দড়ি—গলায় দড়ি! একটা বাঙালী জুটল না,

শেষকালে শিখ! বাঙালীর মুখে চুনকালি পড়তে আর কী বাকি রইল?

উষা যদি শিখের বদলে বাঙালীর সঙ্গে পালাইত তাহা হইলে কিরূপে বাঙালীর গৌরববৃদ্ধি হইত বুঝিলাম না। যাহোক, সুশীলবাবু উষ্ণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিলে আমি ধীরাজের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যে-বৌ শিখ-ড্রাইভারের সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়াছে, ধীরাজ তাহাকে খুঁজিতে যাইতেছে। যদি খুঁজিয়া পায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। পতিব্রতা নারীর গল্প শুনিয়াছি, পঙ্গু স্বামীকে কাঁধে তুলিয়া বেশ্যালয়ে গিয়াছিলেন; কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ রূপকথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। ধীরাজ একটা নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিল।

কিন্তু কেন? প্রেম? নিকষিত হেম? ইহাই যদি প্রেম হয় তবে ঝাড়ু মারি আমি প্রেমের মুখে।

মাস-তিনেক পরে সুশীলবাবুই আবার নূতন খবর আনিলেন। লোকটির সংবাদ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অসামান্য। কেন যে সংবাদপত্রের রিপোর্টার না হইয়া কেরানীগিরি করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। বলিলেন,—'ধীরাজবাবু শিখ-ড্রাইভারের হাত ছাড়িয়ে বৌকে ফিরিয়ে এনেছেন, মনের সুখে ঘরকন্না করছেন।'

'তাই নাকি! অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা খুবই উন্নত। কিন্তু শিখ-ড্রাইভারকে বোধহয় ফিরিয়ে আনেননি, এখন নিজেই মোটর হাঁকাচ্ছেন। আবার নতুন গাড়ী, কাঁচপোকার মতো রঙ!'

আমার বন্ধুর তালিকা হইতে ধীরাজের নাম কাটিয়া দিয়াছি। আমি যদি কোনোদিন বিবাহ করি, পাড়া-গাঁ হইতে একটা হাবাগোবা মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিব। তথাপি যদি সে কাহারও

সহিত পলায়ন করে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর একটা হাবাগোবা মেয়ে বিবাহ করিব। আমার জীবনাদর্শের সহিত ধীরাজের জীবনাদর্শের কোনো মিল নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ধীরাজ-দম্পতিকে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম, ছবি শেষ হইলে ভিড়ের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিতে করিতে পথে বাহির হইয়াছি, দেখি ধীরাজ একটা কাঁচপোকা-রঙের চকচকে নূতন গাড়ীতে স্টীয়ারিং-হুইলের পিছনে উঠিয়া বসিল, তাহার স্ত্রী পাশে বসিল। ধীরাজের চেহারা এবং বেশভূষায় আবার লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাঁচপোকা-রঙের মোটর মোলায়েম সুরে হর্ন বাজাইয়া চলিয়া গেল। আমাকে বোধহয় দেখিতে পায় নাই।

তারপর আরো দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে, ধীরাজকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। সে বালিগঞ্জে বাড়ী কিনিল কিনা খবর রাখি নাই। সুশীলবাবুর অনুসন্ধিৎসাও আর নাই, মেসে ধীরাজকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসাও থামিয়া গিয়াছে। একই কেচ্ছা লইয়া মানুষ কতকাল ঘাঁটাঘাঁটি করিতে পারে? অনেক নূতন কেচ্ছা আসিয়া পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

একদিন রবিবার দুপুরবেলা দিবানিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখি ধীরাজ তক্তপোশের পাশে বসিয়া আছে। আবার সেই পুনর্মূষিক অবস্থা। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, চুলে তেল নাই, মুখ শুষ্ক।

কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলাম। চোখেমুখে জল দিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিলাম।

'কী, আবার বৌ পালিয়েছে! এবার কার সঙ্গে পালাল? গুজরাতী না মাদ্রাজী?'

সে উত্তর দিল না, মুখখানা কেমনধারা করিয়া বসিয়া রহিল।

বলিলাম,—'তা মুখ বুজে বসে থাকলে কি হবে, কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়্, বৌকে খুঁজে ঘরে নিয়ে আয়। আমি কিন্তু টাকা ধার দিতে পারব না।'

ধীরাজ আস্তে আস্তে বলিল,—'উষা কলকাতাতেই আছে··· তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এল না—' পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিল।

কাগজের ভাঁজ খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে মেয়েলি অক্ষরে লেখা আছে—'তোমার সঙ্গে আর আমার পোষাচ্ছে না, আমি আর একজনের সঙ্গে চললাম। তুমি এই চিঠির জোরে ডিভোর্স নিতে পার। —উষা'

চিঠি ফেরত দিয়া বলিলাম,—'তবে তো রাস্তা খোলা। কার সঙ্গে পালিয়েছে?'

ধীরাজ পূর্ববৎ ম্রিয়মাণ সুরে বলিল,—'শিরাজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তার ছেলের বাড়ীতে আছে। বাড়ীর ফটকে দারোয়ানের পাহারা, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।'

'তাহলে আবার বৌকে ফিরিয়ে আনতে চাস্! ধন্যি তুই। ধন্যি তোর ভালবাসা!'

সে ক্লান্তস্বরে বলিল,—'তুই সবই ভুল বুঝেছিস। ভালবাসা নয়। কিন্তু যাক। আমাকে পুরনো চাকরিটা আবার জুটিয়ে দিতে পারিস? টাকাকড়ি সব গেছে, বাসাটাও হপ্তাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।'

বলিলাম,—'চাকরি খোয়ানো যত সহজ, জোটানো তত সহজ নয়। চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'দেখিস। বাক্স-বিছানা সব আছে তো? আচ্ছা, আজ উঠি, কাল দেখা করব।—উষা বড় পয়মন্ত ছিল।'

চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরাজ চলিয়া গেল।

পরদিন বিকালে অফিস হইতে বাহির হইয়া দেখি ধীরাজ ল্যাম্প্‌পোস্টে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ধীরাজের জীবন-প্রহসন যে এমন ট্র্যাজিক্ সুরে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

সবেমাত্র অফিস-আদালতের ছুটি হইয়াছে, রাস্তা দিয়া বাস্ ও মোটরের উদ্দাম স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমি ফুটপাথে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ রাস্তায় একটা বিশেষ রকমের মোটর-হর্নের আওয়াজ শুনিয়া ধীরাজ তীরবিদ্ধের ন্যায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ী মন্থরগতিতে যাইতেছে; গাড়ীতে বিলাতী বেশধারী মালিক-চালকের পাশে বসিয়া আছে ধীরাজের স্ত্রী উষা। তাহাদের গাড়ী আমাদের ছাড়াইয়া কিছুদূর গিয়াছে, ধীরাজ চীৎকার করিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া গাড়ীর পিছন পিছন ছুটিল। তারপর—

বিকাল সাড়ে-পাঁচটার সময় সদর রাস্তা দিয়া পাগলের মত ছুটিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিল।

একটা দ্রুতগামী বাস্ তাহাকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল, বিপরীত দিক হইতে অন্য একটা বাস্ তাহাকে মাড়াইয়া চলিয়া গেল।—

ধীরাজের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি। সে বলিয়াছিল—ভালবাসা নয়! তবে কী? সে বুদ্ধিমান এবং অলসপ্রকৃতির মানুষ

ছিল। তাহার মনে টাকার ক্ষুধা ছিল, ভোগবিলাসের লোভ ছিল। বিবাহের পর তাহার কপাল খুলিয়াছিল; আবার বৌ পালাইবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার দারুণ অবনতি হইয়াছিল। ধীরাজের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বৌ তাহার ভাগ্যদাত্রী; তাই সে প্রাণপণে নষ্ট-চরিত্র স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাই কি তাহার মনস্তত্ত্ব? এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিংবা—হয়তো—

ঊষা পাঠক ধীরাজকে কেন বিবাহ করিরাছিল সে-রহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই। স্বৈরিণী নারীর মন বোঝা আমার কর্ম নয়। তবে ঊষা যে ভাগ্যবতী নারী তাহাতে সন্দেহ নাই। ধীরাজের জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা সে পাইয়াছে।

হেমনলিনী

বৈদ্যনাথবাবু বর্তমানে যে শহরটিতে বাস করিতেছেন তাহার নাম উহ্য রহিল। বৈদ্যনাথবাবুর নামও বৈদ্যনাথ নয়। অজ্ঞাত-বাস করিতে হইলে নাম-ধাম সম্বন্ধে একটু সতর্কতা প্রয়োজন।

শহরটি খুব বড় নয়, মহকুমা শহর। বাঙালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এইখানে একটি ছোট বাসা লইয়া গত ছয় মাস বৈদ্যনাথবাবু একাকী অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

বৈদ্যনাথবাবুর বয়স ছাপ্পান্ন বছর, মাত্র এক বছর তিনি সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শুষ্ক নীরস গোছের চেহারা; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা; নাকের নীচে গোঁফের প্রজাপতি সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শরীর এখনও বেশ সতেজ ও সমর্থ আছে।

বৈদ্যনাথবাবুর সংসারে গৃহিণী, এক পুত্র এবং পুত্রবধূ ছিল। পুত্রটি ভাল চাকরি করে, পুত্রবধূও শান্তশিষ্ট মেয়ে, কিন্তু গৃহিণীর স্বভাব ছিল প্রচণ্ড। তবু, যতদিন বৈদ্যনাথবাবু চাকরিতে ছিলেন ততদিন যুদ্ধবিগ্রহের অবকাশ বেশী ছিল না। কিন্তু তিনি যখন অবসর লইয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন, তখন রণরঙ্গ প্রায় অষ্টপ্রহর-ব্যাপী হইয়া উঠিল। বৈদ্যনাথবাবুর হৃদয়ে যথেষ্ট তেজ থাকিলেও রসনার প্রাখর্যে তিনি গৃহিণীর সমকক্ষ ছিলেন না। প্রতি খণ্ডযুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিতে লাগিল।

এইরূপ পরিস্থিতি বৈদ্যনাথবাবু ছয় মাস সহ্য করিলেন, তারপর একদিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। চুপিচুপি ব্যাঙ্কের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি ফেরারী হইলেন। ব্যাঙ্কের সহিত ষড়যন্ত্রের কারণ, পেন্সনের টাকা যথাস্থানে পৌঁছানো চাই।

তদবধি বৈদ্যনাথবাবু শান্তিতে আছেন। জগবন্ধু নামক এক ভৃত্য পাইয়াছেন, সে রন্ধন করিয়া খাওয়ায় : ক্ষুদ্র বাড়ীর চারিপাশে ক্ষুদ্র বাগান আছে, সকাল বিকাল তাহার পরিচর্যা করেন, দ্বিপ্রহরে খবরের কাগজ পড়েন ; সন্ধ্যার সময় পার্কে বেড়াইতে যান ; এবং রাত্রিকালে একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। তাঁহার মনে কোনও খেদ নাই ; কেবল একটি আশঙ্কা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে উঁকিঝুঁকি মারে ঃ গৃহিণী সন্ধান করিয়া এখানে না আসিয়া জোটেন !

যাহোক, এখানে নিরুপদ্রবে ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে ; বৈদ্যনাথ-বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বাড়ী হইতে পার্ক মাইলখানেক দূরে ; বেশী লোকের ভিড় নাই। প্রত্যহ এখানে গিয়া বৈদ্যনাথ-বাবু একটি বেঞ্চিতে বসিয়া বিশ্রাম করেন, তারপর পকেট হইতে দু'টি বিস্কুট বাহির করিয়া ভক্ষণ করেন। তারপর সন্ধ্যা ঘনীভূত হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

আজ শীতটা বেশ চাপিয়া পড়িয়াছে, পার্কে লোক নাই বলিলেই হয়। বৈদ্যনাথবাবু একটি বিস্কুট শেষ করিয়া দ্বিতীয়টিতে কামড় দিতে যাইবেন এমন সময় পায়ের গোড়ালির কাছে বরফের মত সিক্ত-শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। হেঁট হইয়া বেঞ্চির তলায় দেখিলেন—

একটি ময়লা হলুদে রঙের কুকুরছানা তাঁহার পায়ের পিছনে বসিয়া আছে এবং ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। কুকুর শাবকের বয়স তিন চার মাসের বেশী হইবে না ; অস্থিসার ক্ষুধার্ত চেহারা, শীর্ণ ল্যাজটি অল্প অল্প নড়িতেছে। বৈদ্যনাথবাবুর সঙ্গে চারি চক্ষুর মিলন হইতেই সে গলার মধ্যে কুঁই কুঁই শব্দ করিল।

বৈদ্যনাথবাবু একটু বিব্রত হইলেন। কুকুরের সঙ্গে তাঁহার কোনও প্রকার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কখনও কুকুর পোষেন নাই। রাস্তার দুই চারিটা কুকুর দেখিয়াছেন, এই পর্যন্ত। তবে এই কুকুরটা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে চায় কেন? পা চাটিয়া দিল কোন্ উদ্দেশ্যে?

তিনি কুকুরকে একটা ধমক দিলেন এবং কাছা দিয়া আসিতে বলিলেন। কুকুর কিন্তু নড়িল না, বেঞ্চির তলায় বসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথবাবু তখন তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া আবার বিস্কুট মুখে দিবার উদ্যোগ করিলেন।

অমনি কুকুরটা আবার তাহার পা চাটিয়া দিল। ভিজা জিভের স্পর্শে তিনি শিহরিয়া পা টানিয়া লইলেন। কি আনন্দ!

তাঁহার সন্দেহ হইল ক্ষুধার্ত কুকুর তাঁহাকে বিস্কুট খাইতে দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছে। তিনি বিস্কুট অর্ধেক ভাঙ্গিয়া কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিলেন। পলকের মধ্যে কুকুর বিস্কুট গলাধঃকরণ করিল এবং বেঞ্চির তলা হইতে বাহিরে আসিয়া বাকি বিস্কুটের পানে নিষ্পলক চাহিয়া রহিল।

বিরক্ত হইয়া বৈদ্যনাথবাবু বিস্কুটের অর্ধাংশ কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। নির্জন রাস্তায় কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আক্রমণ করিবার লোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বৈদ্যনাথবাবু পশমের গলাবন্ধ ভাল করিয়া মাথায় জড়াইয়া লইলেন। কিছু দূর গিয়া একটা আলোক স্তম্ভের কাছে আসিয়া তিনি পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। কুকুরটা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। দশ গজ পিছনে আসিতেছে।

তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হস্ত আস্ফালন করিয়া তর্জন

করিলেন। কুকুর দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পলায়ন করিল না। তিনি আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর দূরত্ব রক্ষণ করিয়া পিছনে চলিল। বিস্কুট তাহার ভাল লাগিয়াছে সন্দেহ নাই।

গৃহে পৌঁছিয়া ফটক খুলিতে খুলিতে তিনি পিছনের অন্ধকারে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। দশ গজ দূরে একটা কিছু নড়িতেছে। ঠাহর করিয়া দেখিলেন, কুকুরের ল্যাজ। তিনি চট্‌ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘরে গিয়া বসিতেই ভৃত্য জগবন্ধু গরম চায়ের পেয়ালা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। তিনি এক চুমুক চা খাইয়া ভারি আরাম অনুভব করিলেন। বলিলেন, 'জগবন্ধু, একটা বিস্কুট এনে দে। আজ একটা বৈ বিস্কুট খাওয়া হয়নি।'

'আজ্ঞে'—বলিয়া জগবন্ধু একবার প্রভুর মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিল। বৈদ্যনাথবাবু বলিলেন, একটা কুকুর। এমন জ্বালাতন করল—'

জগবন্ধু প্লেটে করিয়া বিস্কুট আনিয়া দিল। তিনি চা সহযোগে খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিলেন—কুকুরটা বোধহয় এখনও ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িতেছে। কিংবা হয়তো ফটক বন্ধ দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রে আহারাদি করিয়া তিনি শয়ন করিলেন। তাঁহার অভ্যাস, রাত্রে শয্যায় শুইয়া তিনি একটি রহস্য কাহিনী পাঠ করেন। দু'একটা খুন-খারাপি রক্তারক্তি না হইলে তাঁহার ঘুম আসে না।

লেপের মধ্যে শরীর বেশ গরম হইয়া আসিয়াছে। চোখের সামনে রহস্য কাহিনীর পাতা ঝাপ্‌সা হইয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহার তন্দ্রাজড়িত চেতনায় একটি ক্ষীণ শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হইল—কুঁইকুঁই কুঁইকুঁই—

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বৈদ্যনাথবাবু কান খাড়া করিয়া রহিলেন। হ্যাঁ, কুকুরই বটে। কোনও অজ্ঞাত উপায়ে ফটক পার হইয়াছে এবং তাঁহার শয়ন কক্ষের দরজার কাছে বসিয়া কুঁইকুঁই করিতেছে।

জ্বালাতন! বৈদ্যনাথবাবু পাশ ফিরিয়া কানের উপর লেপ চাপা দিলেন, কিন্তু কুকুরের কাকুতি লেপ ভেদ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কোথাকার আপদ আসিয়া জুটিল। একটা কিছু করা দরকার, নহিলে সাররাত ধরিয়া হয়তো কুঁইকুঁই শব্দ চলিতে থাকিবে।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বৈদ্যনাথবাবু ডাকিলেন, 'জগবন্ধু!' কিন্তু জগবন্ধুর সাড়া পাওয়া গেল না। সে রান্নাঘরে শোয়, সম্ভবত কানে কম্বল চাপা দিয়া ঘুমাইতেছে।

তিনি তখন নানা প্রকার বিরক্তিসূচক শব্দ করিতে করিতে লেপ ছাড়িয়া উঠিলেন। বাহিরের দরজা খুলিতেই এক ঝলক হাড়-কাঁপানো হাওয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, সেই কুকুরটা অদূরে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছে। তাঁহার যেমন রাগ হইল তেমনি একটু দয়াও হইল। আহা, এই শীতে একটা প্রাণী তাঁহার আশ্রয় চায়। কিন্তু তিনি তিরিক্ষি ভাবে বলিলেন,—'কি চাস্?'

কুকুরটা বোধহয় তাঁহার কণ্ঠস্বরে করুণার আভাষ পাইয়াছিল, সে বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বৈদ্যনাথবাবু ত্বরিতে দ্বার বন্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার পথ রোধ করিলেন।

কুকুরটা দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আড় চোখে তাঁহার পানে চাহিতে লাগিল, তাহার ল্যাজটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাড়িয়া চলিল। বৈদ্যনাথবাবু ভাল করিয়া তাহাকে দেখিলেন। মাদি কুকুর, সরু ছুঁচোলে মুখ, কানদুটা তীক্ষ্ণভাবে উঁচু হইয়া আছে, গায়ের হলদে

লোম স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, একেবারে খাঁটি লেড়ি কুত্তা। ইহারা রাস্তায় জন্মগ্রহণ করে, রাস্তায় জীবন যাপন করে এবং অন্তিমে রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন করে। ইহাদের গৃহ নাই।

বৈদ্যনাথবাবু বিরাগপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—'আজ থাকো। কাল সকালেই বিদেয় করে দেবো।'

শয়ন করিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। কুকুরটা হয়তো সারা দিনে ওই একটা বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই খায় নাই। আশ্রয় যখন দিয়াছেন তখন তাহার পেটের জ্বালা নিবারণ করিলে দোষ কি? তিনি রান্নাঘরে গিয়া এক টুক্‌রা পাঁউরুটি আনিয়া কুকুরটার সামনে ফেলিয়া দিলেন। সে পাঁউরুটির উপর লাফাইয়া পড়িয়া খাইতে লাগিল, তাহার ল্যাজটা উন্মত্তভাবে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিল।

বৈদ্যনাথবাবু লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার খাটের পাশে একটা হরিণের চামড়ার পাপোষ ছিল, আলো নিভাইবার পূর্বে তিনি লক্ষ্য করিলেন, কুকুরটা আহার সম্পন্ন করিয়া দ্বিধাজড়িত পদে আসিয়া হরিণের চামড়ার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিল।

দুই

কুকুরটাকে কিন্তু তাড়ানো গেল না। বৈদ্যনাথবাবুর মনে বোধ হয় তেমন লৌহকঠিন দৃঢ়তা ছিল না, উপরন্তু দেখা গেল জগবন্ধুর কুকুরের প্রতি বিশেষ আসক্তি আছে। সে বলিল,—'বাড়ীতে একটা কুকুর থাকা ভাল বাবু, বাড়ী পাহাড়া দিতে পারবে। আজকাল যা চোরের দৌরাত্ম্যি হয়েছে।

বৈদ্যনাথবাবু দোনা-মনা হইয়া সম্মতি দিলেন 'বেশ থাক।

কিন্তু আমি কুকুরের তরিবৎ করতে পারব না। যা করবার তুই করবি।'

জগবন্ধু বলিল, আজ্ঞে। তরিবৎ আর কী, এঁটো-কাঁটা খাবে আর বাড়ীতে থাকবে। চারটে পয়সা দিন বাবু, একটা কারবলিক সাবান কিনে আনি।'

সেদিন দুপুরবেলা কুকুর কারবলিক সাবান মাখিয়া গরম জলে স্নান করিল। বৈকালে জগবন্ধু কুকুরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া আনিয়া বৈদ্যনাথবাবুকে দেখাইল। তিনি দেখিলেন সাবান দিয়া স্নান করিয়া কুকুরের শ্রী ফিরিয়াছে, গায়ের হল্‌দে লোমে সোনালি ঝিলিক খেলিতেছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিস কেন?'

জগবন্ধু বলিল,—'দিনের বেলা বেধে রাখলে রাত্তিরে কুকুরের রোক বাড়ে বাবু।'

বৈদ্যনাথবাবু ভাবিলেন,—'হুঃ, লেড়িকুত্তার আবার রোক!'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি পার্কে গেলেন না, বাজারের দিকে গেলেন। বাজারের রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার চোখে পড়িল, একটা দোকানের সামনে লম্বা লম্বা শিকল ঝুলিতেছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি একটা শিকল কিনিয়া ফেলিলেন, দোকানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইয়ে—কুকুরের বকলস আছে নাকি?'

'আজ্ঞে আছে'—দোকানি চামড়ার চকচকে বকলস বাহির করিয়া দিল। বৈদ্যনাথবাবু বকলস কিনিলেন। এই সময় তাঁহার পিছন হইতে ভারী গলায় একজন বলিল,—'এই যে বদ্যিনাথবাবু! কার জন্যে বকলস কিনছেন?'

বৈদ্যনাথবাবু ফিরিয়া দেখিলেন—শঙ্করাচার্য। এ শহরে আসিয়া

বৈদ্যনাথবাবুর কেবল এই ব্যক্তিটির সহিত সামান্য হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার নাম শঙ্করনাথ আচার্য। শহরের ফাজিল ছেলেরা তাঁহাকে শঙ্করাচার্য বলিত। বিপুল চেহারা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক; শঙ্করবাবু সকল বিদ্যার পারঙ্গম ছিলেন। পৃথিবীতে এমন প্রশ্ন নাই যাহার উত্তর তিনি জানিতেন না। এবং তাঁহার মন্তব্য যত বিস্ময়করই হোক তাহা খণ্ডন করিবার সাহস কাহারও ছিল না।

বৈদ্যনাথবাবু থতমত হইয়া বলিলেন,—'এই—একটা কুকুর পুষেছি—তাই—'

শঙ্করবাবু প্রশ্ন করিলেন,—'কী কুকুর পুষেছেন? অ্যাল্‌-সেশিয়ান্ ড্যাল্‌সেশিয়ান স্পেনিয়েল পিকেনিজ পুড্‌ল্—?'

'ওসব নয়। রাস্তার কুকুর।'

শঙ্করবাবু গম্ভীর ভৎর্সনার কণ্ঠে বলিলেন,—'রাস্তার কুকুর বলে কোনও কুকুর নেই, সব কুকুরই কুকুর, সব কুকুরেরই কুকুরত্ব আছে। চলুন দেখি গিয়ে।'

দু'জনে ফিরিয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে শঙ্করবাবু কুকুর পরিদর্শন করিলেন। কুকুরের নখ দেখিলেন, কান ধরিয়া টানিলেন, ল্যাজ মাপিলেন। তারপর বলিলেন,—'জাতের ঠিক নেই বটে কিন্তু ভাল কুকুর। অন্তর্তেজা কুকুর।'

বৈদ্যনাথবাবু বলিলেন,—'অন্তর্তেজা!'

শঙ্করবাবু বলিলেন,—'বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু ভেতরে তেজ আছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এর বাপ ছিল গোল্‌ডেন ককার আর দাদামশাই ছিল অ্যাল্‌সেশিয়ান। আপনি পুষতে পারেন।'

বৈদ্যনাথবাবু বলিলেন,—'ওর একটা নাম দরকার, কি নাম রাখি বলুন তো?'

শঙ্করবাবু কুকুরের সোনালি লোম দেখিলেন, কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিলেন, তারপর বলিলেন,—'হেমনলিনী।'

তিন

হেমনলিনী বৈদ্যনাথবাবুর গৃহে শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। শীত গিয়া বসন্ত আসিল, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, হেমনলিনী সাবালিকা হইয়া উঠিল।

জগবন্ধু তাহার পরিচর্যা করে, স্নান করায়, খাইতে দেয়। কিন্তু হেমনলিনীর সমস্ত ভালবাসা পড়িয়াছে বৈদ্যনাথবাবুর উপর। সে দিনের বেলায় সামনের বারান্দায় বাঁধা থাকে, সন্ধ্যার সময় তাহাকে খুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে ফটকের বাহিরে পদার্পণ করে না। বৈদ্যনাথবাবু খবরের কাগজ পড়িতে বসিলে সে অপলক নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে। তিনি বেড়াইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলে সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু বৈদ্যনাথবাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান না। রাস্তার কুকুরগুলা ভারি বজ্জাত, হেমনলিনীকে কামড়াইয়া দিতে পারে।

রাত্রে বৈদ্যনাথবাবুর খাটের নীচে পাপোষের উপর হেমনলিনী শয়ন করে; সে অন্য কোথাও শুইবে না। তিনি যতক্ষণ রহস্য কাহিনী পড়েন ততক্ষণ সে মিটিমিটি চাহিয়া থাকে, তিনি আলো নিভাইয়া শয়ন করিলে সেও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিদ্রা যায়।

হেমনলিনী তেজস্বিনী কিনা এ বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সামনের রাস্তা দিয়া প্যাণ্টুলুন-পরা মানুষ যাইলে সে একটু বকাবকি করে, এই পর্যন্ত। বাড়ীতে

অপরিচিত লোক প্রবেশ করে ইহাও সে পছন্দ করে না। নচেৎ তাহার মেজাজ ভারি ঠাণ্ডা।

বৈদ্যনাথবাবু আনন্দে আছেন। হেমনলিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ জন্মিয়াছে। কী একটা অভাব তাঁহার জীবনে ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু অলক্ষিতে আকাশের ঈশান কোণে যে মেঘ সঞ্চিত হইতেছে তাহার খবর তিনি জানিতেন না। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় আসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাকালে বৈদ্যনাথবাবু যথারীতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পার্কের দিকে অর্ধেক পথ যাইবার পর তিনি পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন বিস্কুট আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া চলিলেন।

চারিদিক ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, তিনি নিজের বাড়ীর পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটা ছ্যাকড়া গাড়ী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়ীর সামনে থামিল। গাড়ীর মাথায় কয়েকটা বাক্স প্যাঁটরা রহিয়াছে। বৈদ্যনাথবাবুর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি রাস্তার পাশে একটা গুলমোর গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

গাড়ী হইতে একটি মহিলা অবতরণ করিলেন। গাছতলায় বৈদ্যনাথবাবুর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। কি সর্বনাশ—গৃহিণী! গুপ্তগৃহের সন্ধান পাইয়াছেন! নিশ্চয় ব্যাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বাক্স প্যাঁটরা লইয়া গৃহিণী কায়েমী ভাবে বসবাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। এখন উপায়?

গলদঘর্ম বৈদ্যনাথবাবু দেখিতে লাগিলেন, গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিল, গৃহিণী গজেন্দ্রগমনে ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কিন্তু কথাগুলা বোঝা গেল না। বোধকরি ভৃত্য জগবন্ধুকে তিরস্কার করিতেছেন। এক মিনিট কাটিয়া গেল।

তারপর—তারপর হেমনলিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ। হেমনলিনীর এমন ভয়ঙ্কর ডাক বৈদ্যনাথবাবু পূর্বে কখনও শোনেন নাই। তাঁহার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এবার হেমনলিনীর কণ্ঠস্বরের সহিত গৃহিণীর কণ্ঠস্বর মিশিল—'ওরে বাবারে! মেরে ফেললে রে!' তারপর গৃহিণী তীরবেগে ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, পশ্চাতে কালরূপিনী হেমনলিনী। গৃহিণী গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, হেমনলিনী শেষবার তাঁহার গোড়ালিতে কামড়াইয়া ছিল।

গাড়ী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করাচার্যই ঠিক বলিয়াছিলেন—হেমনলিনী অন্তর্তেজা কুকুরই বটে! তাছাড়া সে বৈদ্যনাথবাবুকে ভালবাসে। যতদিন হেমনলিনী আছে ততদিন বৈদ্যনাথবাবুর ভয় নাই।

ঘটনাক্রমে সেইদিন উপরোক্ত ব্যাপারের ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্করবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, বৈদ্যনাথবাবু হেমনলিনীকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন,—'কাণ্ডটি কী? কুকুর কোলে করে বসে আছেন যে!'

বৈদ্যনাথবাবু গদগদ কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন,—'শঙ্করবাবু, আমি হেমনলিনীর বিয়ে দেব। আপনাকে একটি সৎপাত্র যোগাড় করে দিতে হবে।'

পতিতার পত্র

সুলোচনার নাম ভদ্রসমাজে পরিচিত হইবার কথা নয়। তবে ভদ্রসমাজে থাকিয়াও যাঁহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সন্দেহজনক গলিঘুঁজিতে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহার নাম জানেন। আর জানি আমি।

আমি ডাক্তার, সুলোচনার মৃত্যুকালে তাহার চিকিৎসক ছিলাম। কঠিন ব্যাধিতে কয়েক মাস ভুগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার বয়স আটত্রিশ কি উনচল্লিশ হইয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি পুরু খাম আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, "ডাক্তারবাবু আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, আর বড় জোর দু-চার দিন; এটা রাখুন, আমার মৃত্যুর পর খুলে পড়বেন।"

খামের মধ্যে একটি উইল ও একটি দীর্ঘ চিঠি ছিল। উইলে সুলোচনা আমাকে তাহার যথাসর্বস্ব, আন্দাজ ত্রিশ হাজার টাকা, নিঃশর্তে দান করিয়াছে। চিঠিখানা তাহার আত্মকথা। এদেশে পতিতার আত্মকথা জাতীয় যে-সব লেখা বাহির হইয়াছে ইহা সে-ধরনের নয়। মানুষের জীবনধারা কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয় এই কাহিনী তাহারই একটি উদাহরণ। নোংরামিও ইহাতে কিছু নাই। তাই নির্ভয়ে ছাপিতে দিলাম।

ডাক্তারবাবু,

জীবনে আমি অনেক পুরুষের সংসর্গে এসেছি। সবাই মন্দ লোক নয়, অনেকে দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ। দু-একজন সত্যিকার সজ্জন ব্যক্তিও দেখেছি। আপনি ডাক্তার, এতে আশ্চর্য

হবেন না। কোনও মানুষই নিখুঁত নয়, সত্যিকার সাধু-সজ্জন ব্যক্তিরও দোষ-দুর্বলতা থাকে।

আপনি যেদিন প্রথম আমার চিকিৎসা করতে আসেন, সেদিন আপনাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি কঠিন ব্যবহার। আপনি কী করে এতবড় ডাক্তার হলেন ভেবে অবাক হলুম। এখন জানি, আপনার কঠিনতার আড়ালে একটি করুণ সদয় হৃদয় আছে, আর আছে রোগ সারাবার অসামান্য ক্ষমতা। আমার রোগ আপনি সারাতে পারেননি, সে দোষ আপনার নয়। প্রথম দিন আমাকে পরীক্ষা করে আপনার মুখে যে-ভাব ফুটে উঠেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম এ-রোগ সারবার নয়। আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি, বলেছিলেন, 'যন্ত্রণার উপশম করতে পারি। তার বেশী কিছু হবে না।'

আপনার কথা মেনে নিয়েছিলুম। আপনি অন্য ডাক্তারকে দেখাতে বলেছিলেন, আমি দেখাইনি। কেন দেখাইনি জানেন? আপনার স্পষ্টবাদিতা ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলুম যদি মরতেই হয় আপনার হাতেই মরব। আপনাকে ভাল লাগার আর-একটা কারণ, আপনাকে দেখে আর-একজনকে মনে পড়ে গিয়েছিল, যিনি ছিলেন আপনার মতই কঠিন আর কঠোর। তাঁর হাতে একবার মরেছি, এবার শেষ মরা আপনার হাতে মরব।

আমরে ঘরের দেয়ালে পাশাপাশি দুটি ছবি টাঙানো আছে। দুটি যুবাপুরুষ। বিশ বছর আগে ওঁরা যুবাপুরুষই ছিলেন; একজনের মুখ ফুলের মত নরম, অন্যজনের মুখ পাথরের মত শক্ত। অপরিচিত নগণ্য মানুষ নয়, দেশ-জোড়া ওঁদের নাম। দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব; স্বাধীনতার যুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওঁরা লড়েছিলেন।

যেদিন প্রথম আপনার দৃষ্টি ওই ছবিদুটির ওপর পড়ল সেদিন আপনি ভুরু তুলে আমার পানে চেয়েছিলেন। আপনার ভুরু-তোলা প্রশ্নের জবাব তখন দিইনি। আজ এই চিঠিতে জবাব দিচ্ছি। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার এই পাপজীবনের সঙ্গে ওই দুটি মহাপ্রাণ দেশনেতার কী সম্বন্ধ।

মরবার আগে আমি আমার জীবনের কাহিনী একজন কাউকে শুনিয়ে যেতে চাই। অন্য কাউকে শোনাতে গেলে সে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে, হয়ত ওঁদের দুজনের নামে মিথ্যে রটনা করবে। কিন্তু আপনি তা করবেন না, আপনি বুঝবেন। ওই বোঝাটুকুই আমার দরকার।

আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়। বাবা ছিলেন বাংলা দেশের পশ্চিম সীমানায় এক শহরের উকিল। শুধু উকিল নয়, একজন স্থানীয় জননায়ক। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। ওকালতি করার সময় পেতেন না, তাই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সুনাম ছিল দেশজোড়া। বাবা অনেক দিন হল মারা গেছেন, কিন্তু জেলার লোক তাঁর নাম এখনও ভোলেনি।

আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলেজে পড়িনি। বাড়িতে সৎমা ছিলেন। তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না বলেই বোধ হয় আমার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। বাবা আমাকে স্নেহ করতেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, তিনি সর্বদা রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকতেন।

ষোল বছর বয়সে আমার বিয়ে হল। সৎমা পাত্র যোগাড় করেছিলেন। বাবা একটু খুঁত-খুঁত করলেন; কিন্তু নিজে ভাল

পাত্র খুঁজে বার করার সময় নেই তাঁর। তিনি খুঁত-খুঁত করতে করতে রাজী হয়ে গেলেন।

বিয়ের মাস তিন-চার পরে স্বামী মারা গেলেন। তাঁর চালচুলো ছিল না, ছিল গুপ্ত ক্যান্সার রোগ; বিয়ের পর ধরা পড়ল। সৎমা নিশ্চয় রোগের কথা জানতেন না, জানলে যত আক্রোশই থাক, বিয়ে দিতেন না। আমাকে বিদেয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু চার মাস পরে বিধবা হয়ে আমি আবার বাপের বাড়ী ফিরে এলুম। সংসারের হাওয়া বিষিয়ে উঠল।

সংসারের বিষাক্ত হাওয়া থেকে পালাবার একটা রাস্তা ছিল আমার। রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে শহরে প্রায়ই সভা-সমিতি হত। ছেলেবেলা থেকেই আমি সভা-সমিতির অধিবেশনে গান গাইতুম। আমার গলা ভাল ছিল, সবাই প্রশংসা করতেন। বিধবা হবার পরও আমার সভায় গান গাওয়া বন্ধ হল না। থান পরে যেতুম, গান গাইতুম। বাবা বলতেন, 'দেশের কাজে নিজের দুঃখ ভুলে যাও।' তিনি নিজে আমার অকালবৈধব্যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই আমাকে এবং নিজেকে ভোলবার চেষ্টা করতেন।

আমার তখন ভরা যৌবন; যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সাধ মেটেনি। বাবার উপদেশ আমার কানে যেত, কিন্তু মন পর্যন্ত পৌঁছুত না। রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক যুবাপুরুষ ছিলেন। তাঁদের দেখতাম, মনটা উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু আমি বিধবা; তাঁরা আমার পানে উৎসুক চোখে তাকালেও কেউ এগিয়ে আসতেন না।

এইভাবে বছর দেড়েক কাটল। তার পর দুজন যুবাপুরুষ এলেন আমাদের শহরে। তরুণ বয়স, কিন্তু দেশজোড়া নাম।

দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাঁদের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শোনবার জন্যে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে; তাঁরা হাত পাতলে মেয়েরা হাজার হাজার টাকার গয়না গা থেকে খুলে দেয়। তাঁরা দুজন যেন জোড়ের পাখি; একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে কাজ করেন; অনেকবার একসঙ্গে জেল খেটেছেন। লোকে বলত, মাণিকজোড়। কেউ বলত, রাম-লক্ষ্মণ। কেউ বলত, কানাই-বলাই।

আমি তাঁদের রাম-লক্ষ্মণ বলব। দুজনের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। রাম ছিলেন নরম-সরম, নবজলধর কান্তি; ভারি মিষ্টি চেহারা। আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন; টকটকে রঙ, লম্বা চওড়া কঠিন দেহ; মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য।

আমি দুজনকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। একথা সাধারণ লোক হয়ত বুঝবে না, কিন্তু আপনি বুঝবেন। আমার মনের কৌমার্য তখনও নষ্ট হয়নি, হৃদয় ভালবাসার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। তাই এঁরা দুজন যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন বাছ-বিচার করতে পারলুম না, দুজনের পায়ের কাছেই আমার হৃদয়-মন ঢেলে দিলাম। যিনি আমাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নেবেন আমি তাঁরই।

সেবার আমাদের শহরে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন ধরে অধিবেশন চলবে; দেশের গণ্যমান্য সব নেতাই এসেছেন। স্থানীয় দেশ-সেবকদের বাড়ীতে নেতাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে; কারুর বাড়ীতে দুজন, কারুর বাড়ীতে তিনজন। আমাদের বাড়ীতে উঠেছেন রাম আর লক্ষ্মণ। বাইরের একটা ঘর ওদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছি। সারাক্ষণ তাঁদের সেবা করছি।

আমার সৎমা ছিলেন গোঁড়াপ্রকৃতির মানুষ, পর্দার আড়াল ছাড়েননি; স্বাধীনতা-আন্দোলনেও বেশী সহানুভূতি ছিল না। তাই আমিই অষ্টপ্রহর অন্দর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করতুম। যতক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ বাড়ীতে থাকতেন আমি তাঁদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতুম। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা, স্নানের আয়োজন, মাথার তেল, আয়না, চিরুনি, বিছানা পাতা, বিছানা তোলা—সব আমি করতুম। শরীরে ক্লান্তি আসত না, মনে হত ধন্য হয়ে গেলুম।

রাম-লক্ষ্মণ কেবল আমার সেবা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। আমার সভায় যাবার অবকাশ ছিল না, তাই তাঁরা আমায় সভার গল্প করতেন। লক্ষ্মণ ভারি গম্ভীর মানুষ, তিনি বেশী কথা বলতেন না; কিন্তু রাম বলতেন। ভারি মজার কথা বলতেন তিনি, মনটা ছিল রঙ্গরসে ভরপুর। সভায় কে কত গরম বক্তৃতা দিলে, কার ওপর পুলিসের নজর বেশী, এই সব কথা বেশ রঙ চড়িয়ে বলতেন। আমার সঙ্গেও রঙ্গরসিকতা করতেন। বলতেন, 'সুলোচনা, তুমি আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে যে-রকম তাজা করে রেখেছ তোমাকেই আগে পুলিসে ধরবে; ক্যাঁক করে ধরে হাজতে পুরবে।'

লক্ষ্মণ ঠাট্টা-তামাসা করতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি সর্বদা আমাকে লক্ষ্য করত, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করত। আমার বুক গুরগুর করতে থাকত। কাকে যে বেশী ভাল লাগে, বুঝে উঠতে পারতুম না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা রাম হঠাৎ সভা থেকে ফিরে এলেন। আমি তখন ওদের ঘরেই ছিলাম, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা করছিলুম; তাঁকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি ক্লান্তভাবে বিছানায় বসে বললেন, 'সুলোচনা, আজ ঝাড়া দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারবে?'

আমি ছুটে গিয়ে চা তৈরি করে আনলুম। তিনি শুয়ে পড়েছিলেন, উঠে চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এক চুমুকে চা খেয়ে করুণ চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনের সদর-মহলে পঁয়ত্রিশটা বছর গেল। অন্দর-মহলের খবর নেওয়া হল না।'

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তিনি আবার বললেন, 'অন্দর-মহলে যে এর মিষ্টি জিনিস আছে তা আগে জানলে হয়ত সদর-মহলে আসাই হত না।'

এই সময় আমার সৎমা দরজার বাইরে থেকে খাটো গলায় ডাকলেন, 'সুলোচনা, এদিকে শুনে যাও।'

বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল ; সেই সঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কোনও রকমে ঘরের বাইরে এলুম। সৎমা আমাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন, 'ভুলে যেও না তুমি বিধবা।'

এইটুকু বলে তিনি চলে গেলেন ; আমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম আমি বিধবা।

শুয়ে শুয়ে মন বিদ্রোহ করল। বিধবা ত কী ? আমার রূপ, আমার যৌবন, আমার ভালবাসা, কিছুই মূল্য নেই এ-সবের ? আমি কি কাগজের ফুল, চীনেমাটির পুতুল ? না, আমি চীনেমাটির পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা চাই, সম্ভ্রম চাই—

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়াল করিনি। সৎমার গলা শুনতে পেলাম—'বিছানায় শুয়ে থাকলে সংসার চলে না। তোমার বাপ

সভা থেকে ফিরে এসেছেন, আরও সবাই এসেছেন। তাঁদের চা-জলখাবার দিতে হবে।'

বাইরের ঘরে আট-দশ জন দেশনেতা জমা হয়েছেন। বেশীর ভাগই প্রবীণ ; রাম-লক্ষ্মণও আছেন। রাজনীতির তীব্র আলোচনা হচ্ছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সকলকে চা-জলখাবার দিলুম। আমাকে কেউ লক্ষ্য করলেন না, এমন কি রামও না। কেবল লক্ষ্মণের ধারাল চোখ ছুটি আমাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগল।

অনেক রাত্রে বৈঠক ভাঙল। সে-রাত্রে আমি কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ভাল ঘুম হল না। আমার জীবনে যেন একটা প্রবল বন্যা আসছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিছু জানি না। ভয় ভয় করছে, আবার উত্তেজনায় মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠছে। রাম আর লক্ষ্মণ ছুজনেই কি আমাকে চান? বুঝতে পারছি না। আমি ওঁদের মধ্যে কাকে চাই? তাও বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে ওঁরা সভায় চলে গেলেন। সভার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আজ আর কাল ছু দিন বাকী। তার পর সবাই চলে যাবেন। আর আমি—?

ছুপুরবেলা রাম ফিরে এলেন। আমাকে দেখে ক্লান্ত হেসে বললেন, 'আজ আর কোনও কাজ হল না, শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি। বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।'

তিনি নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে রইলেন। আমি কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'চা আনব?'

তিনি চোখ খুলে একটু হাসলেন ঃ না, দরকার নেই। তুমি বরং আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।'

ডাক্তারবাবু, মানুষের দেহ-মনের সব খবরই আপনি জানেন, তাই আমার তখনকার দেহ-মনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে

আপনার ধৈর্যের উপর জুলুম করব না। পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ সম্বন্ধে হিন্দু মেয়ের মনে তীক্ষ্ণ সচেতনতা আছে আপনি জানেন।···আমি খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। ঘন কোঁকড়া চুল, সিঁথি নেই, কেবল কপাল থেকে পিছন দিকে বুরুশ করা।···

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার পানে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে কতকটা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'আমাদের সমাজে বিধবার এত অমর্যাদা কেন? কী অপরাধ বিধবার? স্বামী মরে গেলেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যাবে কেন? তার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই? আমাদের সমাজ নিষ্ঠুর, স্ত্রীজাতির প্রতি দয়ামায়া নেই; একটু ছুতো পেলেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। অন্য সভ্য সমাজে কিন্তু এ-রকম নেই, বিধবা হবার দোষে কোনও মেয়ের জাত যায় না—'

আমি সমস্ত শরীর শক্ত করে শুনছি, এমন সময় লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মুখ অন্ধকার; চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রামের পানে একবার তাকালেন, তার পর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার জন্যে এক পেয়ালা চা আনতে পারবে?'

আমি চোরের মত পালিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

পনরো মিনিট পরে দু পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এসে দেখলুম, ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে দুজনের চাপা গলার আওয়াজ আসছে। চাপা গলা হলেও আওয়াজ নরম নয়, করাতের শব্দের মত কর্কশ। ওঁদের মধ্যে চাপা গলায় বচসা হচ্ছে। কথা সব বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হল লক্ষ্মণ বলছেন, 'তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ—'

দোরে টোকা দিতে সাহস হল না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলুম। রান্নাঘরে একলা বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই কি দুই বন্ধুর মধ্যে—! তবে কি ওঁরা দুজনেই আমাকে চান ?

সন্ধ্যার পর আজও বৈঠক বসল, খুব তর্কাতর্কি হল। রাম আর লক্ষ্মণ কিন্তু ঘরের দুই কোণে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন, আলোচনায় যোগ দিলেন না। কেবল আমি যখন সকলকে চা দেবার জন্যে ঘরে এলুম তাঁদের চোখ আমার পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত্রি নটা আন্দাজ বৈঠক ভাঙল, সকলে উঠলেন। বাবা আর রাম অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বাড়ীর সদরে লক্ষ্মণ আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ লক্ষ্মণ আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি চমকে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলুম, কিন্তু তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ়স্বরে বললেন, 'সুলোচনা, তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। কিন্তু এখন নয়। কাল আমাদের সভার অধিবেশন শেষ হবে, তারপর বলব। তুমি তৈরী থেক। যাও, এখন ভেতরে যাও। কাউকে কিছু বোল না।'

আমার মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল ; অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়ীর মধ্যে গেলুম।

সারা রাত জেগে শুধু ভাবলুম, কী কথা বলবেন আমাকে ? কিসের জন্যে তৈরী থাকব ?

পরদিন সকাল থেকে হৈ-হৈ লেগে গেল। আজ সভার শেষ অধিবেশন, এলোমেলো নানা কাজ হবে। তার ওপর গুজব রটে গেছে যে, কয়েকজন নেতাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে। ভোর থেকে বাড়ীতে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। বাবা চা খেয়েই

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সভায় চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, 'তুমিও এস। সভায় বন্দে মাতরম্ গাইবে।'

সেদিন বন্দে মাতরম্ গাওয়া কিন্তু আমার হল না। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, চারিদিকে পুলিস গিসগিস করছে; জনতা মুহুর্মুহু চীৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্!

তিন-চার জন বড় বড় নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন; তার মধ্যে রাম একজন। লক্ষ্মণ গ্রেপ্তার হননি। আমি যখন উপস্থিত হলুম তখন পুলিস বন্দীদের নিয়ে মোটরে তোলবার উপক্রম করছে। বন্দীদের সকলের মুখে উদ্দীপ্ত হাসি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রাম ফিরে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে চারিদিকে চোখ ফেরালেন, যেন কাউকে খুঁজছেন। তার পর তাঁর চোখ পড়ল আমার উপর। তিনি একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলেন, মুখের উদ্দীপ্ত হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। ইংরেজের জেল আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

বন্দীদের নিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। তারপর সভায় কী হল আমি জানি না, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ী ফিরে এলুম। সভায় আরও অনেক মেয়ে ছিল, তারা সবাই সেদিন কেঁদেছিল; আমার চোখের জল কেউ লক্ষ্য করেনি। আমার চোখের জলের উৎস যে আরও গভীর তা কেউ জানতে পারল না। কেবল, বাড়ী ফিরে আসবার পর, সৎমা আমাকে কাঁদতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না।'

ইচ্ছে হল, বাড়ী ছেড়ে ছুটে কোথাও চলে যাই। বিধাতা যে অলক্ষ্যে সেই ব্যবস্থাই করছেন তা ত তখন জানতুম না।

দুপুরবেলা লক্ষ্মণ বাড়ী এলেন। মুখ বিষণ্ণ কঠিন। আমার

পানে খানিক তাকিয়ে রইলেন, মুখ একটু নরম হল। আবার বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ বোঝা যায় না। আমি কেবল সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'আমাদের জীবনে জেলখানা ঘর-বাড়ী, ওতে বিচলিত হলে চলে না। আমাকেও হয়ত আজ নয় কাল যেতে হবে। কিন্তু তার আগে অনেক কাজ সেরে নেওয়া চাই—সুলোচনা!'

ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, মুখ তুলে তাঁর মুখের পানে চাইলুম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন: 'তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?'

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বললাম, 'যাব।'

'স্বেচ্ছায় যাবে? আমি জোর করছি না।'

'যাব।'

'হয়ত যা আশা করছ তা পাবে না। তবু যাবে?'

'যাব।'

তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন; চোখ দুটি যেন করুণায় ভরে উঠল। তারপর আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইভাবে দাঁড়িয়েই বললেন, 'বেশ। এখন আমি যাচ্ছি। রাত্রে আবার ফিরে আসব। বারোটার পর। গাড়ি নিয়ে আসব। তুমি তৈরি থেক।'

'আচ্ছা।'

তিনি চলে গেলেন।

সেদিনের কথা এখন ভাবলে মনে হয়, কেন তাঁর কথার মানে

বুঝিনি। তিনি ত ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর অটল হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্যে টলে গিয়েছিল। সেদিন যদি আমি 'না' বলতুম! যদি বলতুম—যাব না তোমার সঙ্গে, যিনি জেলে গেছেন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করব, তা হলে আমার জীবনটাই অন্য পথে যেত। কিন্তু তা ত হবার নয়। আমি যে ওদের দুজনকেই সমান ভাবে চেয়েছিলুম। সৎমা যে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পালান ছাড়া আমার গতি ছিল না।

দুপুর রাত্রে তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন। আমি তৈরি ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার নিরুদ্দেশের পথে অভিসার শুরু হল।

প্রথমে রেলের স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কাশী। ডাক্তারবাবু, শেষ কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। সব কথা খুঁটিয়ে লিখতে ক্লান্তি আসছে।

লক্ষ্মণ আমাকে কাশীর একটা সরু গলিতে অন্ধকার একটা বাড়ীতে তুললেন। আধবয়সী একজন স্ত্রীলোক এসে আমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল, একটা সাজানো ঘরে বসাল। লক্ষ্মণ ঠিকে গাড়ির ভাড়া মেটাবার জন্যে পিছিয়ে ছিলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু তিনি এলেন না। আধবয়সী স্ত্রীলোকটাকে প্রশ্ন করলুম, সে বলল, 'আসবেন, বাছা আসবেন। কত বাবু-ভায়েরা আসবেন। নাও, এই শরবতটুকু খেয়ে ফেল। তেষ্টার সময়, শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

সেই রাত্রে আমার জীবনে বেঁচে থাকার পালা শেষ হল, প্রেত-জীবন আরম্ভ হল। ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম, পতিতা হলুম।

পরদিন সকালবেলা লক্ষ্মণ এলেন। তাঁকে দেখে আমি কেঁদে উঠলুম: 'আপনি আমার এই সর্বনাশ করলেন!'

তিনি নীরস নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার যে-সর্বনাশ করেছি তার জন্য ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু আমার বন্ধুকে বাঁচাবার অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

'কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছিলুম?'

'অপরাধ কেউ করেনি। তুমি আমার বন্ধুকে চেন না, আমি তাকে চিনি। তার মন তোমার দিকে ঝুঁকেছিল; আমি যদি তোমাকে চিরদিনের জন্যে তার সামনে থেকে সরিয়ে না দিতাম, সে হয়ত তোমাকে বিয়ে করত।'

'তাতে কি এতই ক্ষতি হত?'

'ক্ষতি হত। তার সর্বনাশ হত, দেশের সর্বনাশ হত। তাকে আমি জানি। তার মন একবার যেদিকে ঝুঁকবে সেদিক থেকে আর তাকে নড়ানো যাবে না। তার মনে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাঁচ ভাগ করে পাঁচ দিকে চালাবার ক্ষমতা তার নেই। সে যদি তোমাকে বিয়ে করত, তা হলে দেশের কাজ আর করত না, তোমাকে নিয়েই মেতে থাকত।'

'কিন্তু আমার কী হবে?'

'দেশের জন্যে অনেকে আত্মবলি দিয়েছে; যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি আজ এই মহাপাতক করলাম। কিসের কী ফল হবে জানি না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু যখন জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে খুঁজতে আসবে তখন তোমাকে পাবে না। পরে যদি তোমাকে খুঁজে পায়ও তোমার কাছে আসতে পারবে না। এই ভরসায় এত বড় পাপ করেছি। —চললাম। আর দেখা হবে না।'

তিনি চলে গেলেন।

তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেদিন আমার যে-জীবন

আরম্ভ হয়েছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। আমার ঘরের দেয়ালে যে-দুটি ছবি দেখে আপনি ভুরু তুলেছিলেন তার মানে বোধ হয় এখন বুঝতে পারছেন। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, ওঁরা দুজন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। ওঁদের নাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। ওঁদের আমি আর দেখিনি, কেবল ছবি টাঙিয়ে রেখেছি নিজের ঘরে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার কথা কি ওঁদের মনে পড়ে? দেশের কল্যাণে যিনি আমাকে নরকের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন আমার কথা মনে পড়লে তাঁর মন কি বেদনায় টনটন করে ওঠে?

কিন্তু আমার কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। সবই আমার ভাগ্য, আমার জন্মান্তরের কর্মফল। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সর্বনাশ না হলে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না?—

এবার শেষ করি। ডাক্তারবাবু, আমার পাপ-জীবনের সঞ্চয় মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আপনার নিজের টাকার দরকার নেই জানি। কিন্তু আমার টাকাকে আপনি ঘৃণা করবেন না। টাকা কখনও নোংরা হয় না ডাক্তার-বাবু। যত নোংরা স্থান থেকেই আসুক, টাকার কলঙ্ক লাগে না। আপনি আমার টাকা নিজের বিবেচনামত সৎকার্যে ব্যয় করবেন।

আপনি আমার অন্তিম প্রণাম নেবেন।

ইতি—

সুলোচনা

ডাক্তারের ফুটনোট :—সুলোচনার টাকা আমার হাতে আসিলে আমি তাহা 'লক্ষ্মণের' নামে বেনামী চাঁদারূপে পাঠাইয়া দিয়াছি। 'লক্ষ্মণ' কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলের উচ্চস্থ ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় এই টাকার সদ্‌গতি করিতে পারিবেন।

মানবী

কাহিনীর সুত্রপাত আজ হইতে পঞ্চাশ বছরেরও আগে। বিংশ শতাব্দীর বয়স তখন অনুমান ছয় বৎসর।

বাগবাজার নিবাসী কৃষ্ণকান্ত দাসের গৃহে উৎসবের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাধাকান্তের বিবাহ। কৃষ্ণকান্ত বিত্তবান ব্যক্তি, কাগজের ব্যবসা করিয়া তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী দিনে দিনে বাড়িতেছে। কিন্তু তিনি বিপত্নীক। বয়স এখনও পঞ্চাশ পূর্ণ হয় নাই।

বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্বে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। রসুনচৌকি বাজিতেছে। আজ বর-বধূ গৃহে আসিবে। বাড়ীর সদর উঠানে আলপনা পড়িয়াছে; ফটকের মাথায় তোরণমাল্য। কন্যাপক্ষ কলিকাতারই বাসিন্দা, এখনি বর-কনে আসিবে। বাড়ীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী, কারণ পুরুষ আত্মীয়েরা সকলেই বরযাত্র গিয়াছে।

রসুনচৌকীর মিঠা আওয়াজ চাপা দিয়া মোড়ের মাথায় গোরার ব্যাণ্ড শোনা গেল। দমাদম শব্দে চারিদিক সচকিত করিয়া শোভাযাত্রা আসিয়া পড়িল। সামনে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে পদাতিক গোরার দল; পিছনে দীর্ঘ বিসর্পিত ঘোড়ার গাড়ির সারি। প্রথমেই একটি পুষ্পমাল্যমণ্ডিত ল্যাণ্ডো গাড়ি, তাহাতে বর ও বরকর্তা শোভা পাইতেছেন। অনন্তর পিছনে মখমলের ঘেরাটোপ ঢাকা পালকি; ইহার মধ্যে আছেন নববধূ। অতঃপর নানাজাতীয় যানবাহনের মধ্যে বরযাত্রীর দল।

বাড়ীর বর্ষীয়সী মেয়েরা ফটকের বাহিরে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল—"ঐ আসছে—ঐ বর-কনে আসছে!"

শোভাযাত্রা বাড়ীর সম্মুখে থামিল, গোরার বাদ্যও নীরব হইল। কৃষ্ণকান্ত লাফাইয়া ল্যাণ্ডো হইতে নামিয়া পড়িলেন, পিছন পিছন রাধাকান্তও নামিল। রাধাকান্তের মাথায় জরিদার টুপি, আগা-পাস্তলা লাল মখমলের পোশাক। তাহার বয়স বারো বছর।

কৃষ্ণকান্ত একটু ব্যস্তবাগীশ লোক, গাড়ি হইতে নামিয়াই উচ্চকণ্ঠে হাঁকাহাঁকি শুরু করিলেন—"কোথায় গেল সব! বর-কনে নিয়ে এলুম, সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস! চন্দ্রমুখী কৈ? কেষ্টমণি!—ওরে, শিগ্‌গির ঘড়ায় করে জল নিয়ে আয়—মঙ্গলঘট—কনে বৌ-এর পালকির সামনে জল ঢাল—'

দুইজন সধবা স্ত্রীলোক কাঁখে কলসী লইয়া আগাইয়া আসিল এবং পালকির সামনে জল ঢালিয়া দিল। কৃষ্ণকান্ত তখন সগর্বে গিয়া পালকির ঘেরাটোপ তুলিয়া দিলেন এবং পালকির ভিতর হইতে একটি মেয়েকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। মেয়েটির বয়স বড়জোর সাত বছর, সোনার গহনায় সর্বাঙ্গ মোড়া। কৃষ্ণকান্ত মহানন্দে বলিলেন, "গ্যাখো, গ্যাখো, কেমন বৌ এনেছি গ্যাখো! যেমন দেখতে তেমনি নাম—দেবী! সাক্ষাৎ দেবী—সাক্ষাৎ মা জগদ্ধাত্রী! কৈ রে রাধাকান্ত, কোথায় গেলি! শিগ্‌গির আয়, আমার পাশে এসে দাঁড়া।'

রাধাকান্ত দ্রুত আসিয়া বাপের পাশে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকান্ত হাঁকিলেন—"আরে, ফটোগ্রাফার কোথায় গেল? শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফটো তুলে নাও—"

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ফটোগ্রাফার ত্রিপদবিশিষ্ট ক্যামেরা সম্মুখে লইয়া অগ্রসর হইল, ক্যামেরা কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে রাখিয়া ঘোমটা হইতে মুখ বাহির করিল, বলিল, 'স্থির হয়ে দাঁড়ান··কেউ নড়বেন না···খুকি, একটু হাসো তো—!'

ফুলশয্যার রাত্রি। একটি ঘর ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। পালঙ্কে ফুলের বিছানা। মৃদু আলো জ্বলিতেছে। রাধাকান্ত ও দেবীকে দুই হাতে ধরিয়া কৃষ্ণকান্ত প্রবেশ করিলেন। কয়েকটি পুরাঙ্গনা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কৌতুক-কৌতূহলী চক্ষে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কৃষ্ণকান্ত বর-বধূকে পালঙ্কের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—"আজ তোমাদের ফুলশয্যা। জীবনে সবচেয়ে সুখের রাত্রি। নাও, দু'জনে বিছানায় শুয়ে পড়।"

পালঙ্কটি বেশ উঁচু। রাধাকান্ত উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু দেবী উঠিতে পারিল না। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহাকে ধরিয়া খাটে তুলিয়া দিলেন, সনিশ্বাসে বলিলেন—"আহা, আজ যদি গিন্নী বেঁচে থাকতেন!"

দেবী রাধাকান্তের পাশে বালিশে মাথা দিয়া শয়ন করিল। কৃষ্ণকান্ত দুইজনকে পরম স্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, এবার তোমরা ঘুমোও। —রাধাকান্ত, মনে রেখো, দেবী তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্মিণী। ওর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।'

কৃষ্ণকান্ত দ্বারের কাছে কৌতূহলী মেয়েদের দেখিয়া বলিলেন, 'তোরা এখানে কেন? যা সব পালা! খবরদার, আড়ি পাতবি না।'

মেয়েরা হাসিতে হাসিতে সরিয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত ঘরের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া ক্ষণেক কান পাতিয়া রহিলেন, যেন ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

খাটের উপর রাধাকান্ত ও দেবী পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহাদের দৃষ্টিতে অনুরাগের চেয়ে বিরাগই বেশী প্রকাশ পাইতেছে। অবশেষে রাধাকান্ত বলিল—'আমি তোমার স্বামী, আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে না।'

দেবী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—'আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি না। আমি লক্ষী মেয়ে।'

রাধাকান্ত তাহার দিকে একটা পা ছড়াইয়া দিয়া বলিল,—'তুমি আমার বৌ। পা টিপে দাও।'

দেবী সতেজে বলিল,—'টিপবো না। আমি কি তোমার চাকর?'

রাধাকান্ত বলিল, 'তবে তুমি লক্ষ্মী মেয়ে নয়। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না।'

দেবী বলিল—'আমিও কথা কইব না। কাল আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।'

দুজনে দুদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

কৃষ্ণকান্ত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া নব-দম্পতির প্রণয়-সম্ভাষণ শুনিতেছিলেন, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণকান্ত আবার আসিয়া দেখিলেন, বর-বধূ নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে। একজনের মাথা পশ্চিম দিকে, অন্যের মাথা দক্ষিণ দিকে। দেবীর পদযুগল পতিদেবতার বক্ষের উপর স্থাপিত। কৃষ্ণকান্ত গভীর স্নেহে ঘুমন্ত দেবীকে কোলে তুলিয়া লইলেন; গদগদ স্বরে বলিলেন,—'মা! মা জননী! ওঠো, তোমার বাবা তোমাকে নিতে এসেছেন।'

সেদিন দেবী পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। তারপর নয় বৎসর স্বামীর সঙ্গে তাহার আর কোনো সম্পর্ক রহিল না। দেবী পিতৃগৃহে রহিল। কৃষ্ণকান্ত প্রতি সপ্তাহে একবার দুইবার গিয়া দেবীকে দেখিয়া আসেন। কিন্তু রাধাকান্তের পত্নীর সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার হুকুম নাই। কৃষ্ণকান্ত স্থির করিয়াছেন, ছেলে-বৌ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের মিলন ঘটিতে দিবেন না।

একুশ বছর বয়সে রাধাকান্ত পরম কান্তিমান যুবাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পরীক্ষা দিবে।

পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লিখিতেছে; দেখিলে মনে হয় খুব মন দিয়াই লেখাপড়া করিতেছে। কিন্তু যদি সন্তর্পণে তাহার কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারা যায়, দেখা যাইবে সে যাহা লিখিতেছে তাহার সহিত আসন্ন পরীক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার লিখনটি এইরূপ—

'প্রিয়তমাসু,

দেবী, তোমার জন্যে আমার মন সর্বদা ছটফট করছে। তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারছি না। এবার জামাইষষ্ঠীর সময় তোমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তোমাকে একবারটি দেখেছিলাম। তাও দূর থেকে, মুহূর্তের জন্যে। আশা মিটল না।

বাবা এত নিষ্ঠুর কেন? শ্বশুরমশাই এত নিষ্ঠুর কেন? কেন আমাদের দূরে রেখেছেন? আমি যে আর থাকতে পারছি না। তোমার কি আমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

আচ্ছা, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করলে কেমন হয়? বেশ মজা হয়, না? তুমি যদি রাজী থাকো আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেউ জানতে পারবে না। তুমি চিঠি লিখো।

আমার একটা ফটোগ্রাফ এই সঙ্গে পাঠালাম। তোমার ফটোগ্রাফ আমাকে পাঠিও। ভালবাসা নিও। অনেক অনেক ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার রাধাকান্ত।'

চিঠি শেষ করিয়া রাধাকান্ত নিজের একটি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ লইয়া চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে পুরিয়া খাম বন্ধ করিয়াছে, এমন

সময় দ্বারের বাহিরে পিতার ফট্ ফট্ চটির শব্দ শুনিয়া চক্ষের নিমেষে খামখানি পকেটে লুকাইল। তারপর একটি বই খুলিয়া একাগ্র চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত এই কয় বছরে আর একটু বৃদ্ধ হইয়াছেন ; পদসঞ্চার ও বাচনভঙ্গী মন্থর হইয়াছে। তিনি কক্ষে প্রবেশ করিতেই রাধাকান্ত সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল—'কি বাবা ?'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—'কিছু নয়, এই দেখতে এলাম। পড়াশুনো বেশ হচ্ছে তো ? পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস বাকি—'

রাধাকান্ত বলিল—'হ্যাঁ, বাবা।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—এই বি. এ. পরীক্ষাটা পাস করে নাও, তারপর আর তোমাকে পড়তে বলব না। অবশ্য তোমাকে পেটের দায়ে চাকরি করতে হবে না। তবে কি জানো বাবা, বি. এ. ডিগ্রিটা হচ্ছে জীবনযুদ্ধে একটা বড় হাতিয়ার। ওটা হাতে থাকা ভাল।'

রাধাকান্ত বলিলেন—'হ্যাঁ বাবা।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—'আজ কি তোমার কলেজ নেই ?'

রাধাকান্ত বলিল—'আছে বাবা। এখনি যাব।'

'হ্যাঁ। চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়। কলেজ কামাই করা ঠিক নয়। আর এই তিনটে মাস বৈ তো নয়। পরীক্ষা হয়ে গেলেই ব্যস্—নিশ্চিন্দি। তখন বৌমাকে ঘরে আনব। তিনটে মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।' কৃষ্ণকান্ত ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

রাধাকান্ত বসিয়া পড়িল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া সনিশ্বাসে বলিল—'তি-ন মা-স !'

ওদিকে দেবীর কাছে রাধাকান্তের চিঠি পৌঁছিয়াছিল। দেবী এখন পূর্ণযুবতী, রূপে, রসে, লাবণ্যে যেন টলমল করিতেছে।

চিঠি দেখিয়া দেবী প্রথমটা বুঝিতে পারিল না কে লিখিয়াছে। তাহাকে তো কেহ চিঠি লেখে না। একটু অবাক হইয়া সে খাম ছিঁড়িল। অমনি রাধাকান্তের ফটো বাহির হইয়া পড়িল। তখন সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিয়াছে কিনা। তারপর আঁচলের মধ্যে চিঠি লুকাইয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

স্পন্দিত বক্ষে সে খাম হইতে ফটো বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। অধরে কখনো একটু হাসি খেলিয়া যায়, চোখদুটি কখনো বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে। জামাইষষ্ঠীর সময় দেবীও রাধাকান্তকে চকিতের ন্যায় দেখিয়াছিল; কিন্তু অতটুকু দেখায় কি মন ভরে? ছবিটা তবু সে কাছে পাইয়াছে, যতবার ইচ্ছে দেখিতে পারিবে।

অবশেষে ছবিখানি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দেবী চিঠি পড়িল। বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল, মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল। রাধাকান্ত যেন দেবীর মনের কথাই দেবীকে লিখিয়াছে। দেবী যেমন স্বামীকে চায়, স্বামীও তেমনি দেবীকে পাইবার জন্য পাগল।

কিন্তু এত আবেগ-বিহ্বলতার মধ্যেও দেবী স্থিরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারায় নাই। সে স্বামীর চিঠিখানি মুঠিতে লইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বুকের তলায় বালিস দিয়া বিছানায় শুইয়া চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। চিঠিতে সলজ্জ অপটু ভাষায় দেবীর মনের ভাব প্রকাশ পাইল—

'শ্রীচরণকমলেষু,

তোমার ছবি আর চিঠি পেয়েছি। আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না, তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে। কবে

তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? বাবা দুপুরবেলা অফিসে যান, বাড়ীতে ঝি-চাকর ছাড়া কেউ থাকে না। তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার দেবী।'

চিঠির মধ্যে নিজের একটি ফটো দিয়া দেবী ঝিয়ের হাতে চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিল।

চিঠি পাইয়া রাধাকান্ত একেবারে মাতিয়া উঠিল। চিঠিতে কথা বেশী নাই, কিন্তু মনের ভাব সুস্পষ্ট। রাধাকান্ত স্বভাবতই একটু ভাবপ্রবণ, একটু হঠকারী, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করা তাহার স্বভাব নয়। সে মনে মনে এক প্রচণ্ড সংকল্প করিয়া বসিল—দেবীকে সে চুরি করিয়া লইয়া পলাইবে।

সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। পরদিন দুপুরবেলা ছ্যাকড়াগাড়ি চড়িয়া রাধাকান্ত শ্বশুর-ভবনে উপস্থিত হইল। দ্বারের কড়া নাড়িতেই দেবী দ্বার খুলিয়া দিল। যেন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রথম সমাগমের লজ্জা কাটিতে একটু সময় লাগিল। রাধাকান্ত হর্ষরোমাঞ্চিত, দেবী বিনতভুবনবিজয়ীনয়না। ক্রমে ভাব হইল, চুপিচুপি ফিসফিস কথা হইল। রাধাকান্ত দেবীর হাত ধরিয়া নিজের বুকের উপর রাখিল—'তোমাকে ছেড়ে আর আমি থাকতে পারছি না। চল, দুজনে মিলে পালিয়ে যাই।'

দেবী চমকিয়া চোখ তুলিল—'পালিয়ে যাবে? কোথায় পালিয়ে যাবে?'

রাধাকান্ত বলিল—'যেদিকে দু'চক্ষু যায়। বাবাদের অত্যাচার আর সহ্য হয় না।'

দেবী ক্ষণেক চিন্তা করিল। পালাইয়া যাইবে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে পালাইয়া যাইতে দোষ কি? সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়াছিলেন, সুভদ্রা—

একটি সিল্কের চাদর গায়ে জড়াইয়া লইয়া দেবী বলিল—'চল।'

কেহ জানিল না, দুইজনে ছ্যাকড়া গাড়ি চড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

দেবীর বাবা হরিমোহন বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলেন দেবী গৃহে নাই, ঝি-চাকরেরা কিছু জানে না। হরিমোহন ভয় পাইয়া বেহাই-এর কাছে ছুটিলেন।

ওদিকে কৃষ্ণকান্তের গৃহে রাধাকান্তও অনুপস্থিত। সে কলেজে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাপার বুঝিতে বৈবাহিক যুগলের বিলম্ব হইল না। তাঁহারা অবিমৃশ্যকারী যুবক-যুবতীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে তল্লাস আরম্ভ করিলেন।

চেনা পরিচিত কাহারো ঘরে ফেরারীদের পাওয়া গেল না। হোটেলেও তাহারা যায় নাই। এদিকে রাত্রি হইয়া গিয়াছে, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। অবশেষে রাত্রি দশটার সময় নগরের প্রান্তে একটি নির্জন পার্কে তাহাদের পাওয়া গেল। একটি বেঞ্চির উপর দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে, দেবীর সিল্কের চাদরটি দুজনের গায়ে জড়ানো। অবস্থা অতি করুণ।

কৃষ্ণকান্ত অপরাধীদের তিরস্কার করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। অপরাধীরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। কৃষ্ণকান্ত হাসি থামাইয়া বলিলেন,—'এই যদি তোদের ইচ্ছে ছিল, আমাদের বললেই পারতিস। চল, এখন ঘরে চল।'

ছেলে-বৌ লইয়া কৃষ্ণকান্ত গৃহে ফিরিলেন।

রাত্রে দেবী ও রাধাকান্ত এক শয্যায় শয়ন করিল। বিবাহের নয় বৎসর পরে তাহাদের প্রকৃত ফুলশয্যা হইল।

বলাবাহুল্য রাধাকান্ত পরীক্ষায় ফেল করিল। কৃষ্ণকান্ত নিরাশ হইলেন বটে, কিন্তু বলিলেন—'আমি জানতাম। যাহোক আর পড়াশুনোয় কাজ নেই, এবার কাজে ঢুকে পড়। আমার বয়স হয়েছে, কবে আছি কবে নেই; তুমি এইবেলা কাজকর্ম শিখে নাও। পৈতৃক ব্যবসাটা যাতে বজায় থাকে।'

রাধাকান্ত পৈতৃক কাজে লাগিয়া গেল। সে বুদ্ধিমান ছেলে, কাজে উৎসাহ আছে। অল্পকাল মধ্যেই সে কাগজের ব্যবসার মার-প্যাঁচ বুঝিয়া লইল। কৃষ্ণকান্তের শরীর অল্পে অল্পে জীর্ণ হইতেছিল, তিনি আর অফিসে যান না, তাঁহার বদলে রাধাকান্ত অফিসের কাজ দেখে। কৃষ্ণকান্ত বাড়াতে থাকেন; বাড়ীর নীচের তলায় কাগজের গুদাম, তাহারই দেখাশুনা করেন।

এদিকে দেবী সন্তান-সম্ভবা। কৃষ্ণকান্ত পৌত্রমুখ দর্শনের আশায় অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। খুব ঘটা করিয়া পুত্রবধূর সাধ দিলেন।

তারপর একদিন কাজ করিতে করিতে কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—'হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা। কাজকর্ম বন্ধ করে দিন। খুব সাবধানে থাকতে হবে।' ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

দেবী শ্বশুরের শয্যাপাশে বসিয়া উদ্বেগভরা চোখে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল, কৃষ্ণকান্ত তাহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'নাতির মুখ দেখে যদি যেতে পারি, তাহলে আর আমার কোনো দুঃখ নেই।'

দেবী শ্বশুরের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। শ্বশুরকে সে সত্যই ভাল বাসিয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত দুচার দিনে একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু বেশী চলাফেরা করেন না, বাড়ীর উপর তলায় অল্পস্বল্প ঘুরিয়া বেড়ান। নাতির মুখ দেখবার জন্যই যেন বাঁচিয়া আছেন।

তারপর একদিন দেবী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। কৃষ্ণকান্ত আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বাড়ীতে নহবৎ বসিল। আত্মীয়-বন্ধুগণের গৃহে মিষ্টান্ন বিতরিত হইল।

আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণকান্ত নাতির মুখ দেখিলেন। বলিলেন—'চাঁদের মত ছেলে হয়েছে। ওর নাম রইল চন্দ্রকান্ত।' তারপর শয্যায় শয়ান পুত্রবধূর হাতে চাবির গোছা দিয়া বলিলেন—'তুমি ছেলের মা হয়েছ, আজ থেকে তুমি এ বাড়ীর গৃহিণী। লোহার সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে রইল। চিরায়ুষ্মতী হও।'

সেই রাত্রে নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকে গমন করিলেন।

আরও পাঁচটি বছর মহাকালের নীল সমুদ্রে মিশিয়াছে।

রাধাকান্ত এখন বাড়ীর কর্তা ; তিনটি সন্তানের পিতা। প্রথম দুটি পুত্র, চন্দ্রকান্ত ও সূর্যকান্ত, তৃতীয়টি কন্যা, নাম গৌরী। প্রথম মহাযুদ্ধের বাজারে কাগজের ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল, রাধাকান্ত বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছে। তাহাকে এখন রীতিমত বড়মানুষ বলা চলে।

দেবীর দেহমনও এই কয় বছরে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সে আর এখন প্রণয়ভয়ভঙ্গুর তরুণী নয়, তিনটি সন্তানের জননী, ঘরের ঘরণী। দেহের যৌবন যেমন অটুট আছে, তেমনি চরিত্র আরও শান্ত-ধীর ও দৃঢ় হইয়াছে। বিষয়বুদ্ধিতে সে স্বামীর সমকক্ষ,

রাধাকান্ত অনেক সময় বিষয়কর্মে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ লইয়া কাজ করে। রাধাকান্তের চরিত্রে যে অবিমৃশ্যকারিতা আছে, দেবী তাহা সংযত করিয়া রাখে।

আজ দেবী ও রাধাকান্তের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। মোটরগাড়ি কেনা হইয়াছে, রথের মত উঁচু প্রকাণ্ড একটি মিনার্ভা গাড়ি। এতদিন ঘোড়ার গাড়িতেই কাজ চলিতেছিল। কিন্তু এখন দিনকাল বদলাইয়া যাইতেছে। মোটর গাড়ি না থাকিলে মান-মর্যাদা রক্ষা হয় না। একজন ড্রাইভার রাখা হইয়াছে, সে জগমগে পোশাক পরিয়া গাড়ি চালাইবে।

সকালবেলা গাড়ি আসিয়াছে, বাড়ীর সামনের উঠান আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনটি ছেলেমেয়ে সকাল হইতে গাড়ির মধ্যেই বাস করিতেছে। ঝি, চাকর পরম কৌতূহলের সহিত গাড়ি প্রদক্ষিণ করিতেছে। জগমগে পোশাক-পরা ড্রাইভার মাঝে মাঝে ঝাড়ন দিয়া গাড়ির ধুলো ঝাড়িতেছে

দশটার সময় রাধাকান্ত ও দেবী দোতলা হইতে নামিয়া আসিয়া মোটরগাড়িতে উঠিল, চাকর এক চ্যাঙারি খাবার গাড়িতে তুলিয়া দিল। ছেলেমেয়েরা আগে হইতেই গাড়িতে ছিল, তাহারা কলহাস্য করিয়া করতালি দিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিল। রাধাকান্ত ও দেবী পরস্পরের পানে চাহিয়া পরম তৃপ্তির হাসি হাসিল। তারপর গম্ভীর স্বরে ড্রাইভারকে বলিল—'চলো, শিবপুর বটানিকাল গার্ডেন।'

আজ মোটরগাড়ি কেনার প্রথমদিনে তাহারা বন-ভোজনে যাইতেছে।

সারাদিন ভারি আনন্দে কাটিল। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত দেহ ও তৃপ্ত মন লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তারপর অনাড়ম্বর গতানুগতিক সুখের দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাধাকান্ত মোটরে চড়িয়া অফিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় তাহার মোটরের এঞ্জিন গোলমাল আরম্ভ করিল। ড্রাইভার মোটর থামাইয়া গাড়ির বনেট খুলিয়া ঠুকঠাক আরম্ভ করিল। গাড়ি আবার চালু হইতে সময় লাগিবে দেখিয়া রাধাকান্ত বাহিরে আসিয়া ফুটপাথে পায়চারি করিতে লাগিল।

সামনেই একটা চায়ের দোকান। এই অবকাশে এক পেয়ালা গরম চা সেবন করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানে খদ্দের বেশী নাই; রাধাকান্ত চা ফরমাশ করিয়া একটি টেবিলের সামনে বসিল।

ঘরে এখনো আলো জ্বলে নাই। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রাধাকান্ত লক্ষ্য করিল—ঘরের কোণে টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া চারজন লোক নিবিষ্টমনে তাস খেলিতেছে।

নির্জন ঘরে ক্রীড়ারত ওই লোকগুলো তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া সে তাহাদের টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল; লোকগুলা কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না, আপন মনে খেলিয়া চলিল।

প্রেম. খেলা চলিতেছে। জুয়া খেলা। কিন্তু ইহারা বেশী বড় দান দিয়া খেলিতেছে না. দু চার আনা দিয়া খেলিতেছে। এ খেলা রাধাকান্তের পরিচিত; সে আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ খেলোয়াড়দের মধ্যে একব্যক্তি মুখ তুলিয়া রাধাকান্তের পানে চাহিল, মৃদু হাসিয়া বলিল—'এ খেলা কি দেখছেন বাবু, নেহাত ছেলেখেলা। যদি সত্যিকার 'বাঘের খেলা' দেখতে চান,

ঐ ঘরে যান।' বলিয়া পাশের একটি ভেজানো দরজা দেখাইল।

রাধাকান্ত একটু ইতস্তত করিল, তারপর দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরটি ছোট, আলো জ্বলিতেছে। গদি-পাতা মেঝের উপর বসিয়া পাঁচ-ছয় জন লোক জুয়া খেলিতেছে। প্রত্যেকের সম্মুখে টাকার স্তূপ।

রাধাকান্তকে দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিল না। একজন বলিল—'আসুন, বসে যান।'

রাধাকান্তের পকেটে দুইশত টাকা ছিল। সে বসিয়া গেল।

ওদিকে দেবী উদ্বেগে বাড়ীময় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। রাধাকান্ত কোনদিন অফিস হইতে বাড়ী ফিরিতে দেরি করে না। তবে আজ কি হইল?

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিল। মুখ শুষ্ক, অপরাধ-লাঞ্ছিত। সে দেবীর কাছে বিলম্বের সত্য কারণ লুকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষ পর্যন্ত সব কথাই প্রকাশ পাইল। সে জুয়া খেলার লোভ সামলাইতে পারে নাই। পকেটে যে দুশো টাকা ছিল, তাহা গিয়াছে।

শুনিয়া দেবী ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া গেল। দুশো টাকা গিয়াছে যাক, কিন্তু জুয়ার নেশা সর্বনেশে নেশা। এ পথে চলিলে বিষয়-সম্পত্তি মান-মর্যাদা কয়দিন থাকিবে। দেবী কাঁদিয়া ফেলিল —'ওগো, এ তুমি কি করলে! জুয়া খেললে যে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।'

রাধাকান্ত অধোমুখে রহিল। দেবী তখন চোখ মুছিয়া বলিল— 'দিব্যি কর, আর কখনো জুয়া খেলবে না।'

রাধাকান্ত শপথ করিল। দেবীর কিন্তু প্রত্যয় জন্মিল না। মেজ ছেলে সূর্যকান্ত ঘরের মেঝেয় খেলা করিতেছিল, দেবী তাহাকে

কোলে তুলিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল—'ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর।'

রাধাকান্ত চার বছরের ছেলে সূর্যকান্তের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিল জীবনে আর কখনো জুয়া খেলিবে না।

একটি একটি করিয়া বছর কাটিয়া যায়। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠিতে থাকে। রাধাকান্তের প্রভাব-প্রতিপত্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ধিত হয়; তাহার রগের কাছের চুলে একটু পাক ধরে। দেবীর শরীরও একটু ভারী হইয়াছে; কিন্তু মনের সজাগ সাবলীলতা অক্ষুণ্ন আছে। সংসারের চারিদিকে তাহার সতর্ক মমতা।

বড়ছেলে চন্দ্রকান্তের বয়স এখন উনিশ, সে সরল ধীর প্রকৃতির ছেলে, কলেজে বি. এ. পড়ে। সূর্যকান্তের বয়স সতরো, স্বাস্থ্যবান, একটু উগ্র প্রকৃতি; খেলাধূলার দিকে মন; লেখাপড়ায় মন নাই; স্কুল ও কলেজের মধ্যবর্তী উঁচু বেড়া পার হইতে পারে নাই। সর্বকনিষ্ঠা গৌরী, বয়স চৌদ্দ, মায়ের মত লাবণ্যবতী নয়, কিন্তু যৌবনের তোরণদ্বারে আসিয়া তাহার আকৃতি বেশ একটি কোমল কমনীয়তা লাভ করিয়াছে। এই গৌরীকে সূত্র ধরিয়া যে সংসারে মহা-বিপর্যয় প্রবেশ করিবে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সে পরের কথা।

চন্দ্রকান্ত লুকাইয়া প্রেমে পড়িয়াছিল, পাশের বাড়ীর মেয়ে অমিয়ার সঙ্গে। অমিয়া সদ্‌বংশের মেয়ে, কিন্তু তাহার বাবার অবস্থা ভাল নয়; কোনো রকমে দিন চলে। দুই পরিবারের মধ্যে মুখ-চেনাচিনি থাকিলেও সামাজিক মেলামেশা নাই। চন্দ্রকান্তের শয়নঘরের জানালা দিয়া অমিয়ার শয়নঘরের জানালা দেখা যায়, মাঝখানে দশ-বারো হাত ব্যবধান। এই জানালা পথেই ভালবাসা

জন্মিয়াছিল। প্রথমে চোখাচোখি হইলে সলজ্জে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, তারপর চোখে চোখ মিলাইয়া হাসি, তারপর চাপাগলায় দুটি একটি কথা। 'তোমার নাম কি?' 'অমিয়া।' 'আমার নাম চন্দ্রকান্ত।' 'জানি।' তারপর ক্রমে হাতমুখ নাড়িয়া ইশারা ইঙ্গিতে প্রেম নিবেদন। প্রেম নিবেদনটা চন্দ্রকান্তের পক্ষেই বেশী, অমিয়া তাহার নাটুকে অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া হাসে।

একদিন সকালবেলা চন্দ্রকান্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে অমিয়াকে প্রাত্যহিক প্রেম নিবেদন করিতেছিল। দুঃখের বিষয়, আজ সে ঘরের দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। দেবী কোনও একটা সাংসারিক কাজের উপলক্ষে ঘরে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর নিঃশব্দে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। চন্দ্রকান্ত মাকে দেখিতে পায় নাই, অন্য জানালা হইতে অমিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। সে চট করিয়া সরিয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত ফিরিয়া দেখিল—মা! মায়ের চোখে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল।

দেবী কঠিন স্বরে বলিল—চন্দ্রকান্ত! তুই—তুই পাশের বাড়ির মেয়েকে ইশারা করছিলি! তোর এতদূর অধঃপতন হয়েছে?'

চন্দ্রকান্ত ঠোঁট চাটিয়া বলিল—'মা—আমি—'

দেবী তীব্র ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ছি ছি ছি চন্দ্রকান্ত, তোর এই কাজ! এ বংশে কেউ কখনো এ কাজ করেনি। আমার ছেলে হয়ে তুই গেরস্তঘরের মেয়ের দিকে নজর দিলি!'

চন্দ্রকান্ত মায়ের পদতলে পড়িয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল—'মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি—আমি অমিয়াকে—বিয়ে করতে চাই—'

দেবীর উগ্র ক্রোধ থমকিয়া গেল, মুখের ভাব একটু নরম হইল—'কি বললি ?'

'মা—আমি—অমিয়া—মানে—আমি ওকে বিয়ে করব।'

দেবী তাহার চুল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

'হতভাগা ! ওঠ। বিয়ে করবি তো আমাকে বলিস নি কেন ?'

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া করুণস্বরে বলিল—'ওরা বড় গরীব, অমিয়ার বাবার একটিও পয়সা নেই। তাই—বলিনি। বাবা শুনলে রাগ করবেন।'

দেবীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল—'ওরা গরীব, আর তোর বাপ বুঝি নবাব ? মেয়েটা দেখতে শুনতে তো ভালই। সত্যি ওকে বিয়ে করতে চাস্ ?'

বিগলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত বলিল—'হ্যাঁ মা, তুমি বাবাকে রাজী কর।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি আগে মেয়ে দেখব। যদি দেখি ভাল মেয়ে, তখন যা করবার করব।'—

দুপুরবেলা রাধাকান্ত অফিস হইতে আহার করিতে আসিলে দেবী তাহাকে কথাটা শুনাইয়া রাখিল। রাধাকান্ত ইতিমধ্যে গৌরীর বিবাহের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করিয়া আনিয়াছিল, বলিল—'বেশ তো। মেয়ে যদি তোমার পছন্দ হয়, দুটো বিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে দাও।'

অপরাহ্ণে দেবী গায়ে চাদর জড়াইয়া পাশের বাড়ীতে গেল। পাশাপাশি দুই বাড়ী, কিন্তু দেবী এই প্রথম অমিয়াদের বাড়ীতে পদার্পণ করিল।

অমিয়ার মা বর্ষীয়সী মহিলা, অমিয়া তাঁহার শেষ সন্তান। দেবীকে দেখিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়া গেলেন, তাহার হাত ধরিয়া

বলিলেন—'বোন, দূর দূর থেকে তোমাকে দেখেছি, কাছে যেতে কখনো সাহস হয়নি। আমার ভাগ্যি, আজ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমার ঘরে পা রাখলেন।' তিনি দেবীকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া মাদুর পাতিয়া বসাইলেন।

দুচার কথা পর দেবী বলিল—'আপনার মেয়ে অমিয়াকে একবার ডেকে দিন। তার সঙ্গে দুটো কথা বলব।'

গৃহিণী কন্যাকে ডাকিলেন। অমিয়া দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। দেবী তাহাকে পাশে বসাইয়া গৃহিণীকে বলিল—'আপনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, আমি অমিয়ার সঙ্গে গল্প করি।'

গৃহিণী মনে মনে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া সরিয়া গেলেন। চন্দ্রকান্ত ও অমিয়ার প্রণয়-কাহিনীর খবর তিনি কিছুই জানিতেন না।

এটা সেটা গল্প করিতে করিতে দেবী অমিয়াকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অত্যন্ত লাজুক মেয়ে, প্রগল্‌ভা মুখরা নয়, দুবার ঢোক গিলিয়া একটা কথা বলে। তার উপর ভয় পাইয়াছে। দেবী বুঝিল, প্রণয় ব্যাপারের জন্য মূলতঃ চন্দ্রকান্তই দায়ী, অমিয়া ছলাকলা দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। মেয়েটিকে তাহার পছন্দ হইল। সে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া বলিল—'চন্দ্রকান্ত তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তোমার মাকে তাহলে বলি?'

অমিয়া চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল। দেবী তখন হাসিয়া বলিল—'আমি কিন্তু ভারি দজ্জাল শাশুড়ী, উন থেকে চুন খসলেই বকুনি খাবে।'

তারপর দেবী উঠিয়া গিয়া অমিয়ার মাকে বলিল—'আমি আপনার মেয়েটিকে নিলুম আমার বড় ছেলের জন্যে।'

অমিয়ার মা স্বর্গ হাতে পাইলেন। অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—

'বোন, এ আমার স্বপ্নের অতীত। কিন্তু আমার যে আর কিছু নেই।'

দেবী বলিল—'আর কিছু তো চাই নি। শুধু মেয়েটি চেয়েছি।—'

মাসখানেক পরে মহা ধুমধামের সহিত একজোড়া বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্তের সহিত অমিয়ার এবং গৌরীর সহিত লালমোহন নামক একটি ধনীসন্তানের।

লালমোহন বনিয়াদী বংশের দুলাল। মোটর ছাড়া এক পা চলে না। যেমন তাহার মেদ-সুকুমার দেহ, তেমনি তাহার রাজা-উজীর-মারা বাক্যচ্ছটা। সে নিজেকে মস্ত একজন ব্যায়ামবীর ও স্পোর্টস্ম্যান বলিয়া মনে করে।

বিবাহের পরদিন সকালবেলা বরকন্যা বিদায়ের পূর্বে রাধাকান্তের বৈঠকখানায় তরুণবয়স্কদের আসর জমিয়াছিল। নূতন জামাই লালমোহনই আসর জমাইয়াছিল। তাহার সঙ্গে ছিল সমবয়স্ক কয়েকজন বন্ধু, বাড়ীর পক্ষ হইতে সূর্যকান্ত উপস্থিত ছিল। চা সহযোগে বিপুল প্রাতরাশের সদগতি হইতেছিল।

তাহার তিনটা রাইফেল আছে ; সে ঘোড়ায় চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে পারে, পোলো খেলাতেও সে নিতান্ত অপটু নয়, লালমোহন এইসব কথা ব'লতে বলিতে বন্ধুদের চিমটি কাটিতেছিল। শ্রোতাকে চিমটি কাটিয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস। শুনিতে শুনিতে সূর্যকান্তের গা জ্বালা করিতেছিল। তাহার ধৈর্য একটু কম, এ ধরনের নির্লজ্জ বড়াই সে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু নূতন ভগ্নিপতিকে কিছু বলাও যায় না। অনেকক্ষণ নীরবে সহ্য করিয়া সে বলিল—'আপনি তো ভারি বাহাদুর। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারেন?'

'পাঞ্জা!' লালমোহন অবজ্ঞায় নাক তুলিয়া বলিল—'ও সব ছোটলোকের খেলা আমি খেলি না।'

সূর্যকান্তও খোঁচা দিয়া বলিল—'গায়ে জোর আছে কিনা পাঞ্জা লড়লে বোঝা যায়।'

লালমোহন বলিল—'আমার গায়ের জোরের দরকার নেই। যতবড় পালোয়ানই আসুক, তাকে শায়েস্তা করবার ক্ষমতা আমার আছে!'

'তাই নাকি! গায়ে জোর না থাকে কি দিয়ে শায়েস্তা করবেন?'

'এই দিয়ে' বলিয়া লালমোহন পকেট হইতে একটি রিভলবার বাহির করিয়া দেখাইল,—'যন্তরটি দেখতে ছোট, কিন্তু এই দিয়ে তোমার মত ছ'জন গুণ্ডাকে শুইয়ে দিতে পারি।'

সূর্যকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হইল, কিন্তু বিতণ্ডা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। রাধাকান্ত এবং আরো লোকজন আসিয়া পড়িল। বরকন্যাকে বিদায় করিবার সময় উপস্থিত।

লালমোহন বধূ লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি তাহাদের দুজনের মনে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের বীজ বপন করিল।

অতঃপর সুখে স্বচ্ছন্দে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। দেবী অমিয়াকে বধূরূপে পাইয়া পরম তৃপ্ত, সে যেমনটি চাহিয়াছিল তেমনটি পাইয়াছে। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, একথাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে, গৌরীর দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় নাই। প্রথম সমাগমের আবেগ-মাধুর্য ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। গৌরীর শ্বশুরবাড়ী কলিকাতাতেই, সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী আসে, তখন তাহার শুষ্ক মুখে করুণ হাসি দেখিয়া

দেবীর বুকে শেল বিদ্ধ হয়। গৌরীকে প্রশ্ন করিলে সে প্রশ্ন এড়াইয়া যায়। তাহার স্বামী যে মদ্যপান করে, বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়, তাহার পৈতৃক বসত-বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে—এ সব কথা সে নিজের মায়ের কাছেও বলিতে পারে না।

কিন্তু একদিন কিছুই আর ঢাকা রহিল না। দুপুরবেলা গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের বাড়ী ফিরিল। তাহার দেহে একটিও গহনা নাই। সে মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। লালমোহন অনেকদিন হইতেই তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছে। আজ ব্যাপার চরমে উঠিয়াছে। গৌরীর বিবাহের যৌতুক আন্দাজ বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল, এতদিন লালমোহন তাহাতে হাত দেয় নাই; আজ সে সেই গহনা চাহিয়া বসিল। গৌরী গহনা দিতে রাজী হইল না, তখন লালমোহন তাহাকে মার-ধোর করিয়া সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি গায়ের গহনাগুলাও ছাড়ে নাই। তারপর বন্ধুদের লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর সকলেই গৌরীর কাহিনী শুনিল। রাধাকান্ত আহার করিতে আসিয়া শুনিল, তারপর অগ্নিশর্মা হইয়া লালমোহনের সন্ধানে ছুটিল। আজ সে দেখিয়া লইবে, এত বড় আস্পর্ধা!

লালমোহন বাড়ী ফেরে নাই। চাকর বলিল, বাবু রেস খেলিতে গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় ফিরিবেন।

রাধাকান্ত রেসকোর্সে গেল। কান ধরিয়া জামাইকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। স্ত্রীর গয়না বেচিয়া রেস খেলা!

রেসকোর্সে লোকারণ্য। রাধাকান্ত পূর্বে কখনও ঘোড়দৌড়ের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করে নাই। সে ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। আধঘণ্টা অন্তর একদল ঘোড়া ছুটিতেছে, দর্শকেরা গগন-

বিদারী চিৎকার করিতেছে; হাজার হাজার টাকা হাতে হাতে লেনদেন হইতেছে। রাধাকান্তের রক্ত চনমন করিয়া উঠিল। সে এদিক-ওদিক জামাইকে তল্লাস করিল, কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে কোথায় জামাই? তখন সে রেলিংএর পাশে দাঁড়াইয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে লাগিল।

অনিবার্য ভাবেই একজন দালাল আসিয়া জুটিল।

'উর্বশী ধরেছেন?'

'উর্বশী!'

'সাম নর রেসে দৌড়ুবে। ঘোড়া নয় পক্ষীরাজ, আকাশে উড়ে চলে।'

'তাই নাকি! তা কি করে ধরতে হয়?'

'আপনার দেখছি এখনও হাতেখড়ি হয়নি। আসুন আমার সঙ্গে।'

রাধাকান্তের সঙ্গে শ'তিনেক টাকা ছিল, তাই দিয়া সে বাকি সব ক'টা রেস খেলিল। রেসের শেষে দেখা গেল সে পঞ্চাশ টাকা জিতিয়াছে। সে উত্তেজিত মনে ভাবিতে লাগিল, সঙ্গে যদি আরও টাকা থাকিত, তাহা হইলে সে আরও জিতিতে পারিত।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া সে রেসের কথা উচ্চারণ করিল না, বলিল, লালমোহনকে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। দীর্ঘ পারিবারিক আলোচনার পর স্থির হইল, লালমোহন উচ্ছন্ন যাইতে চায় যাক, গৌরী বাপের বাড়ীতে থাকিবে।

পরের শনিবার রাধাকান্ত আবার রেস খেলিতে গেল। দেবী কিছুই জানিল না। এই ভাবে চুপি চুপি জুয়া খেলা চলিতে লাগিল। রাধাকান্তের রক্তে জুয়ার প্রচণ্ড নেশা ছিল; সে শপথ ভুলিয়া গেল, তাহার সহজ বিষয়বুদ্ধিও লোপ পাইল।

শীতের শেষে ঘোড়দৌড়ের মরসুম যখন শেষ হইল, তখন

রাধাকান্তের ব্যবসায়ের তহবিলে যত টাকা ছিল সব গিয়াছে, উপরন্তু আকণ্ঠ দেনা।

রেসের শেষ দিনে সন্ধ্যাবেলা রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিল না। দেবী জানিত রাধাকান্ত অফিসে আছে, তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই। কিন্তু রাত্রি নটা বাজিয়া যাইবার পরও যখন সে ফিরিল না এবং অফিসে টেলিফোন করিয়াও কোন খবর পাওয়া গেল না তখন দেবী দুই ছেলেকে লইয়া রাধাকান্তের অফিসে গেল।

শূন্য অফিসে রাধাকান্তের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত্যুকালে নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া দেবীকে একটি চিঠি লিখিয়া গিয়াছে।

এই মর্মান্তিক আঘাতে দেবী প্রায় ভাঙিয়া পড়িল। কিছুদিন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। তারপর উঠিয়া যন্ত্রের মত গৃহকর্ম করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবসর কালে শয়নকক্ষে রাধাকান্তের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত—মনে মনে প্রশ্ন করিত—কেন এ কাজ করতে গেলে? কেন? টাকাই কি বড়? আমরা কি কেউ নই?

কিন্তু তাহার মাথার উপর নিয়তির খড়্গ যে এখনো উদ্যত হইয়া আছে, তাহা সে জানিত না।

শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ জানাজানি হইবার পর হঠাৎ লালমোহন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোন রহস্যময় উপায়ে আবার তাহার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। মুরুব্বিয়ানা চালে মোটর হইতে নামিয়া শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিল, গ্রাম্ভারি মুখে সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'আমি আছি, তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

গৌরী দীর্ঘকাল পরে স্বামীকে দেখিয়া বোধ করি আনন্দিত হইল, কিন্তু সূর্যকান্ত তাহার লম্বা লম্বা কথায় জ্বলিয়া উঠিল।

কথা-কাটাকাটি আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না। সূর্যকান্ত বলিল —'তোমার জন্যেই বাবা আত্মহত্যা করেছেন। তুমি দায়ী।'

লালমোহনও গরম হইয়া উঠিল—'ডেঁপোমি কোরো না। ইস্কুলের ছেলে, লেখাপড়া কর গিয়ে।'

গৌরী ও চন্দ্রকান্ত উপস্থিত ছিল, তাহারা ঝগড়া থামাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিয়তির লিখন কে খণ্ডাইবে? ঝগড়া চরমে উঠিল। সূর্যকান্ত বলিল—'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

লালমোহন বলিল—'তোমার হুকুম নাকি? যাব না। এটা আমার শ্বশুরবাড়ী, আমারও হক আছে।'

সূর্যকান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল, লালমোহন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সূর্যকান্তের বুকে গুলি করিল। চক্ষের নিমেষে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

বন্দুকের আওয়াজে ঝি-চাকর যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবী আসিয়া যখন পুত্রের রক্তাক্ত দেহ কোলে তুলিয়া লইল, তখন সূর্যকান্তের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। লালমোহন পিস্তল হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর। দেবী ছেলের মৃত-দেহ বুকে জড়াইয়া মেয়ে-জামাইয়ের পানে চোখ তুলিল, অকম্পিত স্বরে বলিল—'চলে যাও তোমরা, দু'জনেই চলে যাও। আর কখনো আমাকে মুখ দেখিও না।'

লালমোহন খুনের দায়ে দায়রা সোপর্দ হইল। মামলা কিন্তু টিকিল না। দেবী আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিল যে, খেলাচ্ছলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে করিতে আচমকা লালমোহনের পকেটের বন্দুক ফায়ার হইয়া গিয়াছিল।

আদালতে সকলেই উপস্থিত ছিল। লালমোহন খালাস পাইবার পর গৌরী আসিয়া মায়ের পা জড়াইয়া ধরিল। দেবী কিন্তু তাহার পানে চাহিল না, কঠিন স্বরে বলিল, 'আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। যাও, আর আমার কাছে এস না। যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাদের মুখ দেখব না।'

রাধাকান্তের মৃত্যুর পর হইতেই তাহার গৃহে মহাজনেরা যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন, রাধাকান্তের সম্পত্তি হইতে সে টাকা উদ্ধার করা যাইবে কিনা এই চিন্তা তাঁহাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এবং যতই দিন যাইতেছিল, তাঁহাদের ব্যবহার ততই কড়া হইয়া উঠিতেছিল।

এদিকে দেবীর হাতে যে নগদ টাকা আছে, তাহাতে কোনমতে সংসার চলে, মহাজনের ধার শেষ করা যায় না। চন্দ্রকান্ত পৈতৃক ব্যবসায়ের কিছুই জানে না। তবু সে প্রাণপাত করিয়া ব্যবসাকে আবার দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু একা নিঃসহায় অবস্থায় সবদিক সামলাইতে পারিতেছে না। ফুটা নৌকার মত দেবীর সংসার ধীরে ধীরে মজিবার উপক্রম করিতেছে।

এই বিপর্যয়ের মধ্যে অমিয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। অন্ধকারের শিশু, তাহার জন্মকালে নহবৎ বাজে নাই, মিষ্টান্ন বিতরিত হয় নাই। কিন্তু এই নাতিকে কোলে পাইয়া দেবী যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। সে এখন আর সংসারে কাজ দেখে না, নাতিকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকে আর চিন্তা করে। অমিয়া নিঃশব্দে সংসারের সমস্ত ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একদিন দেবী চন্দ্রকান্তকে ডাকিয়া বলিল—'পাওনাদারদের

সকলকে খবর দে, তারা যেন কাল সকালে আসে। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব।'

চন্দ্রকান্ত চমৎকৃত হইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিল। এতদিন সে সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল, এখন তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। আর ভয় নাই, মা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পরদিন সকালে পাঁচ-ছয় জন পাওনাদার আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। তারপর দেবী নাতিকে কোলে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধবার শুভ্র বেশ, মুখে শান্ত গাম্ভীর্য: সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবী ধীর কণ্ঠে বলিল—'আপনারা বলুন। আমি কুলস্ত্রী আজ লজ্জা ত্যাগ করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমার কথা আপনাদের শুনতে হবে।'

একজন বলিলেন—'বলুন বলুন, কি বলবেন বলুন।'

দেবী বলিল—'আমার স্বামী আপনাদের কাছে টাকা ধার করেছিলেন। আমার স্বামীর ঋণ আমি শোধ করব; এক পয়সা বাকী রাখব না। কিন্তু আমাকে একটু সময় দিতে হবে।'

পাওনাদারেরা চুপ করিয়া রহিলেন।

দেবী আবার বলিল—'আমি আজই আপনাদের পাওনা শোধ করতে পারি। আপনাদের আদালতে যেতে হবে না, ডিক্রিজারি করতে হবে না। আমার এই বাড়িখানা আছে, আরও কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে, গায়ের গয়না আছে; সে সব বিক্রি করে আপনাদের টাকা চুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে আমার ছেলেপিলে খেতে পাবে না, আমার এই নাতি এক ঝিনুক দুধ পাবে না। আপনারা কি তাই চান?'

একজন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'না, না, সে কি কথা?

আমরাও ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু—'

দেবী বলিল—'তবে আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করুন। আমি আমার এই নাতির মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি, আপনাদের টাকা আমি শোধ দেব, আমার স্বামীর ঋণ আমি রাখব না। আমাকে দয়া করে এক বছর সময় দিন।'

দেবীর কথা মহাজনদের মর্মস্পর্শ করিল, তাঁহারা এক বছর অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন হইতে দেবী কাজে লাগিয়া গেল। লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রীতিমত অফিস যাইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত সঙ্গে থাকিত, দেবী স্বামীর আসনে বসিয়া কাজ-কর্ম পরিচালনা করিত। পুরনো বিশ্বাসী কর্মচারীরা একে একে ফিরিয়া আসিল, সম ব্যবসায়ী কয়েকজন বন্ধু বিধবাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাধাকান্তদের বিলাত হইতে অনেক কাগজ আমদানী হইত, মাঝে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিলাতী কাগজওয়ালাদের সঙ্গে আবার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দেখিয়া-শুনিয়া পুরাতন গ্রাহকরাও ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

একবৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর ব্যবসা আবার দাঁড়াইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ইতিমধ্যে কাজকর্ম শিখিয়া লইয়াছিল। তাহাকে অফিসে বসাইয়া দেবী বলিল,—'এবার তুই চালা। কাল থেকে আমি আর আসব না।'

পরদিন পাওনাদারদের ডাকিয়া দেবী তাঁহাদের টাকা চুকাইয়া দিল। তাঁহারা ধন্য ধন্য করিতে করিতে টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবী কিন্তু ভিতরে ভিতরে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিল;

তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

নাতিটি ইতিমধ্যে দেড় বছরের হইয়াছে। দেবী তাহার নাম রাখিয়াছে উষাকান্ত। তাহার এখন পা হইয়াছে, সে সারাক্ষণ ঠাকুরমার আঁচল-চাপা থাকিতে রাজী নয়। খেলা করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যায়, উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে।

একদিন এক কাণ্ড হইল। বাড়ীর নীচের তলায় কাগজের গুদাম; উষাকান্ত গুদামের দ্বার খোলা পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর কেমন করিয়া কাগজের গুদামে আগুন লাগিয়া গেল। শিশুকে কেহ গুদামে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, অথচ বাহিরেও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

দেবী তখন সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তাহার নিজের দেহ পুড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু উষাকান্তের গায়ে আঁচ লাগিল না।

তারপর দমকল আসিয়া আগুন নিভাইল। আর্থিক ক্ষতি বেশী হইল না বটে, কিন্তু দেবী সর্বাঙ্গে দহনক্ষত লইয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বিশেষ ভরসা দিতে পারিলেন না; জীবনের আশা খুবই কম। তিনি যন্ত্রণা লাঘবের প্রলেপ দিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে দেবী অমিয়ার আঁচলে নিজের চাবির গোছা বাঁধিয়া দিয়া বলিল,—'আমি চললুম। আজ থেকে তুমি এ বাড়ির গিন্নী।' চন্দ্রকান্তও উপস্থিত ছিল, দুইজনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

গৌরার শ্বশুরবাড়ীতে বিলম্বে খবর পৌঁছিয়াছিল। দুপুর রাত্রে গৌরী আসিল, মায়ের বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবী কিন্তু চোখ খুলিয়া মেয়ের পানে চাহিল না। গৌরী কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিল,—'মা, একবার কথা বল। বল আমাদের ক্ষমা করেছ।'

দেবী কিন্তু কথা কহিল না, চোখ মেলিয়া চাহিলও না। তারপর তাহার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে উঠিয়া গৌরীর মাথার উপর স্থাপিত হইল; আঙ্গুলগুলি গৌরীর চুলের মধ্যে একটু খেলা করিল।

তারপর তাহার অবশ হাত গৌরীর মাথা হইতে খসিয়া পড়িল।

দেবীর জীবনলীলা শেষ হইয়াছে।

স্মৃত-মিত-রমণী

গায়ে গায়ে দু'টি বাড়ী। একটিতে আমি বাস করি, অন্যটিতে গুরুচরণ। প্রায় কুড়ি বছর এইভাবে বাস করিয়াছি; প্রথম যখন ডাক্তারি পাস করিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করি তখন হইতে। তখন আমার বয়স ছিল ছাব্বিশ, গুরুচরণের হয়তো দু'এক বছর বেশী। গুরুচরণ সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছিল, আমি তখনও অবিবাহিত। এই জেলা শহরটি বাছিয়া লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সংকল্প ছিল প্র্যাকটিস্ না জমাইয়া বিবাহ করিব না।

আজ কয়েদিন হইল গুরুচরণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ফলে কিছু দায় আমার ঘাড়ে পড়িয়াছে; এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করাও হয়তো তাহারই একটা অংশ। বন্ধুকৃত্য নয়, কারণ এত বছর ধরিয়া পাশাপাশি বাস করার ফলে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল তাহাকে বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। কিন্তু মাঝে মাঝে সত্য কথা বলারও একটা দায় আছে, নহিলে আত্মসম্মান থাকে না।

গুরুচরণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের প্রধান অন্তরায় ছিল আমাদের প্রকৃতিগত বৈষম্য। চেহারা এবং চরিত্র, কোনও দিক দিয়াই আমাদের মধ্যে মিল ছিল না। তাহার চেহারা ছিল ঝড়ে পালক-ছেঁড়া ছাতারে পাখির মত; রোগা ন্যুব্জ শরীর, অস্থিসার মুখ, পুরু কাঁচের চশমার ভিতর দিয়া চোখদুটি মাছের চোখের মত দেখাইত। তাহার সরু পা' দুটি অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে চলিত; মুখ দিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বাহির হইত। মোটের উপর তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, সে সর্বদাই উত্তেজিত হইয়া আছে। আমি ডাক্তার তাই

জানিতাম, তাহার শরীরে মারাত্মক রোগ না থাকিলেও স্নায়ু সুস্থ ছিল না।

প্রথম যেদিন বাসা ভাড়া লইয়া সদর দরজার পাশে নিজের নামযুক্ত ধাতুফলক লটকাইয়া দিলাম সেইদিন বৈকালে গুরুচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি আসর সাজাইয়া প্রথম রোগীর প্রতীক্ষা করিতেছি, সে ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়া বলিল,—'আপনি ডাক্তার অবনী রায়? নতুন প্রাকটিস আরম্ভ করেছেন? বেশ বেশ, পাড়ায় একজন ডাক্তার পাওয়া গেল। নতুন এসেছেন, যদি কিছু দরকার হয় বললেন। আমি পাশের বাড়িতে থাকি।' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

প্রথম দর্শনে তাহাকে রোগী ভাবিয়া মনে যে আশ্বাস জাগিয়াছিল তাহা রহিল না বটে, কিন্তু একটি সজ্জন প্রতিবেশী পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া কতকটা নিরুৎকণ্ঠ হইলাম। নবাগত অপরিচিত ডাক্তারকে প্রতিবেশীরা উপেক্ষাই করিয়া থাকে, অযাচিতভাবে সাদর সম্ভাষণ করে না।

ক্রমে পরিচয় হইল। গুরুচরণ স্থানীয় ম্যুনিসিপাল অফিসে চাকরি করে। উপরন্তু অবসরকালে বীমার দালালি করে। মন্দ রোজগার করে না। বছর দেড়েক আগে বিবাহ করিয়াছে। বৌএর নাম সুষমা। আকৃতি প্রকৃতিতে গুরুচরণের ঠিক বিপরীত। দেহে যৌবনশ্রী আছে, মুখে শান্ত মন্থর নিরুদ্বেগ ভাব। বয়স বোধকরি কুড়ি-একুশ, এখনও সন্তানাদি হয় নাই।

গুরুচরণ রোজই আমার ডিসপেন্সারিতে আসে, তড়বড় করিয়া দু'চার কথা বলিয়া চলিয়া যায়। একদিন সে একজন লোককে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া বলিল,—'ডাক্তারবাবু, একে দেখুন তো, এর অসুখ করেছে।'

লোকটিকে পরীক্ষা করিলাম, ঔষধ দিলাম। দু'তিন দিনের মধ্যে রোগ সারিয়া গেল। পয়সা অবশ্য বেশী পাইলাম না, শুধু ঔষধের দাম। কিন্তু আমার প্র্যাকটিস আরম্ভ হইয়া গেল। ক্রমে দুটি একটি রোগী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

তিন চার মাস পরে গুরুচরণ আমাকে তাহার বীমা কোম্পানীর ডাক্তার করিয়া লইল। আমার কিছু আয় বাড়িল, গুরুচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। সে সামান্য লোক ছিল, শহরে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। লোকে তাহাকে অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতুকের চক্ষে দেখিত; আড়ালে গুরুচরণ না বলিয়া সরুচরণ বলিত। কিন্তু ঐহিক ব্যাপারে আমি তাহার কাছে ঋণী ছিলাম। একথা ভুলিতে পারি না। আর ভুলিতে পারি না একটা উন্মত্ত ঝড়ের রাত্রি। কিন্তু ঝড়ের রাত্রির কথা পরে বলিব।

দিন কাটিতেছে, পসার বাড়িতেছে। আগে নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করিতাম, এখন একজন কম্পাউণ্ডার রাখিয়াছি। আমার বাসাটি একতলা, পাঁচটি ঘর আছে; সামনের দুটি ঘর লইয়া ডাক্তারখানা, পিছনের তিনটি ঘর বাসস্থান। একজন পাচক-ভৃত্য গোড়া হইতেই ছিল।

একদিন সকালবেলা গুরুচরণ হন্তদন্ত হইয়া আসিল—'ডাক্তার-বাবু, কাল রাত্রির থেকে সুরমার গা গরম হয়েছে, গায়ে ভীষণ ব্যথা। একবার দেখবেন?'

তৎক্ষণাৎ দেখিতে গেলাম। গুরুচরণের স্ত্রীকে পূর্বে বহুবার দেখিয়াছি। গুরুচরণের অফিস যাওয়ার সময় সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত; সেই সময় আমার সঙ্গে কদাচ চোখোচোখি হইয়া গেলে তাহার চোখ সম্ভ্রমে নত হইত, খোঁপায় আটকানো মাথার আঁচলটা সিঁথি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিত। কথা বলিবার

উপলক্ষ্য কখনও হয় নাই। তখনকার দিনে মফঃস্বলে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার রেওয়াজ ছিল না, একটু আড়ষ্টতার ব্যবধান থাকিত।

সুরমা চাদর গায়ে দিয়া মুদিতচক্ষে শুইয়া ছিল, গুরুচরণ বলিল, —'সুরমা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

সুরমা চোখ মেলিল, তারপর আবার চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া শুইল।

পরীক্ষা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'শরীরে কষ্ট কিছু আছে?'

একটু নীরব থাকিয়া সুরমা বলিল,—'গায়ে ব্যথা।'

'আচ্ছা, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

রাস্তায় নামিয়া গুরুচরণ ব্যগ্রস্বরে বলিল,—'ভয়ের কিছু নেই তো?'

বলিলাম,—'ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, ভয়ের কি থাকতে পারে? তবে দেখাশুনো করা দরকার। আপনি আজ আর অফিস যাবেন না।'

সে বলিল,—'অফিসে একবারটি যাব, ছুটি নিয়ে চলে আসব। রান্নাবান্নাও তো আজ আমাকেই করতে হবে।'

বলিলাম,—'তার দরকার নেই। আমার পদ্মলোচন আছে, সে দু'জনের রান্না রাঁধবে। রোগীর সাবু বার্লির ব্যবস্থা হবে। এখন আসুন, আপনাকে একটা গুলী খাইয়ে দিই। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটা ছোঁয়াচে।'

ডিসপেন্সারিতে গিয়া গুরুচরণকে একটি প্রতিষেধক বড়ি খাওয়াইলাম। সে বলিল,—'আপনি সুরমার জন্যে ওষুধ তৈরি করে রাখুন, আমি দশ মিনিটের মধ্যে অফিস থেকে ফিরব। বিয়ে হয়ে

পর্যন্ত ওর একদিনের জন্যেও শরীর খারাপ হয়নি, এই প্রথম। তাই একটু—' বলিতে বলিতে সে তাহার কাঠির মত পদযুগল অফিসের দিকে চালিত করিয়া দিল।

গুরুচরণ স্ত্রীকে ভালবাসিত, তাহার পরিচয় বহুবার বহুভাবে পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য কিছু নেই; যৌবনকালে নিজের স্ত্রীকে কে না ভালবাসে। তাহার পত্নীপ্রেম যৌবনের অবসানেও টিঁকিয়াছিল ইহাও বোধকরি খুব বড় কথা নয়। বরং তাহার পত্নীপ্রেম আমার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায় যখন ভাবি তাহার পুত্র-স্নেহের কথা। কিন্তু পুত্র এখনও আসে নাই; রাম না জন্মিতে রামায়ণ কথা আরম্ভ করিব না।

সুরমা কয়েকদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিল। কিন্তু গুরুচরণের আশঙ্কা যায় না, সে বলিল,—'ডাক্তার, ওকে একটা টনিক লিখে দিন, যাতে শিগ্‌গির চাঙ্গা হয়ে ওঠে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম,—'ওর টনিকের দরকার নেই। স্বাস্থ্য খুব ভাল, আপনিই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বরং আপনি যদি টনিক চান তো দিতে পারি।'

সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—'না না, আমার টনিক কি হবে। আমি দেখতে একটু রোগা বটে, কিন্তু রোগ নেই। মাঝে মাঝে হাঁপানিতে কষ্ট পাই, কিন্তু সে কিছু নয়। আমার পনরো হাজার ইন্সিওর আছে, যদিই ভালমন্দ কিছু হয় সুরমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না।—যাই, অফিসের বেলা হল। আপনি কিন্তু ওকে একটা ভাল টনিক লিখে দেবেন।'

তারপর সুরমা মাঝে মাঝে মাছ তরকারি রাঁধিয়া আমার জন্য পাঠাইয়া দেয়, কখনও নিজের হাতে মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া পাঠায়। সে ভারি সুন্দর দরবেশ তৈরি করিতে পারে—

বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এখনও অবস্থা অনুকূল নয়। শহরে যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটকালি আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এড়াইয়া যাইতেছি। আগে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিৎ পাকা হোক, তারপর বিবাহ—

আমি প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করার পর দেড় বছর কোন দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর একদা রাত্রিকালে আসিল দুরন্ত ঝড়। ইহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। মানুষের মনে ত্রাস জাগাইয়া, অনেক পুরানো বাড়ী ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমার বাসাটা অক্ষত ছিল বটে কিন্তু গুরুচরণের রান্নাঘরের মটকা উড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার পর বছর ঘুরিবার আগে গুরুচরণের জীবনে অপরূপের আবির্ভাব ঘটিল। সুরমা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল।

ছেলে পাইয়া গুরুচরণ পাগল হইয়া গেল। আনন্দে দিশাহারা হইয়া সে যত্রতত্র নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহার জিহ্বা এবং পদদ্বয় আরও দ্রুত হইয়া উঠিল। রাস্তায় চেনা পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইলে পুত্রজন্মের সংবাদ তৎক্ষণাৎ দেওয়া চাই। ছেলে আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে তাহাকে কোলে লইয়া আমার কাছে উপস্থিত—'দ্যাখো ডাক্তার, কী ছেলে! কী স্বাস্থ্য! আট পাউণ্ড ওজন। ওর নাম রেখেছি পঙ্কজ। কেমন নাম?'

'খাসা নাম।'

'গণৎকারকে দিয়ে কুষ্ঠি করিয়েছি। লেখাপড়ায় ভাল হবে, দীর্ঘজীবী হবে, হাকিম হবে।'

'বেশ বেশ।'

ছেলের বয়স ছয় মাস, অর্থাৎ ঘাড় শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

গুরুচরণ তাহাকে ট্যাঁকে লইয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদণ্ড ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যদি চাকরি যাইবার ভয় না থাকিত বোধকরি ছেলেকে লইয়া অফিস যাইত। সুরমার কিন্তু আবাহন বিসর্জন নাই, সুস্থ দেহ ও শান্ত নিরুদ্বেগ মন লইয়া সে যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল।

মনে আছে এই সময়, অর্থাৎ গুরুচরণের ছেলের বয়স যখন ছয়-সাত মাস তখন আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। তার বছর খানেক পরে আমারও একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ছেলে লইয়া আমি মাতামাতি করি নাই! কিন্তু এটা আমার গার্হস্থ্য ইতিবৃত্ত নয়, গুরুচরণের কাহিনী, তাই নিজের কথা যথাসম্ভব বাদ দিয়া যাইব।

গুরুচরণের মনে অন্য চিন্তা নাই, মুখে অন্য কথা নাই, শুধু পঙ্কজ পঙ্কজ। পঙ্কজ একটু হাঁচিলে কি কাশিলে অমনি ডাক্তার। ছেলের স্বাস্থ্য ভাল, বেশ গোলগাল নধর, তাই ঔষধপত্র বেশী দিতে হয় না। গুরুচরণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছেলেকে কখনও পিঠে কখনও কাঁধে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিয়া আমারই যেন লজ্জা করে।

কিন্তু গুরুচরণের বাৎসল্য রসের ইতিহাস আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করিতে গেলে মহাভারত হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে কাজ নাই। পঙ্কজের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন গুরুচরণ তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলে হাকিম হইবে, সুতরাং হাকিমকে গোড়াপত্তন একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল দাঁড়াইয়া গেল। তাহার স্বভাব কতকটা মায়ের মত; পড়াশুনায় অখণ্ড মনোনিবেশ; খেলা করে, তাও ধীর শান্তভাবে।

এই সময় গুরুচরণের কিছু ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মনে

হইয়াছিল, পুত্রকে স্কুলে পাঠাইবার পর পুত্রের প্রতি তাহার বাৎসল্যের উগ্রতা প্রশমিত হইয়াছে। সে তড়বড়ে ছিল বটে, কিন্তু খিটখিটে ছিল না; এই সময় তার মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন আমার সামনেই পঙ্কজের কান মলিয়া দিয়া গালে একটা চড় মারিল। তাছাড়া আমার সঙ্গেও যেন একটা দূরত্ব আসিয়া পড়িয়াছিল। আগে প্রত্যহ কারণে অকারণে আমার কাছে আসিত, এখন কাজ না থাকিলে আসে না। সম্প্রতি তাহার কাজের চাপ বাড়িয়াছিল; অফিসের কাজ তো ছিলই, বীমার কাজও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই সকলের সহিত তাহার ব্যবহার খিটখিটে ও অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তত তখন আমার এইরূপই ধারণা হইয়াছিল।

কিন্তু এ ভাব তাহার বেশী দিন রহিল না। দুই তিন মাস পরেই দেখিলাম, সে ছেলেকে হাত ধরিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেছে। একবার খেলা করিতে করিতে পঙ্কজের আঙুল কাটিয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ উদ্বেগ ও উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া হাসি পায় অথচ উপেক্ষা করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ছেলেটাকে একটি এ. টি. এস. ইঞ্জেকশন পর্যন্ত দিতে হইল।

যেদিন পঙ্কজ স্কুলে প্রাইজ পাইল সেদিন গুরুচরণ পাড়ায় মিষ্টান্ন বিতরণ করিল। প্রায় নাচিতে নাচিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল,—'দেখেছ ডাক্তার, কী ছেলে! একেবারে হীরের টুকরো। এ ছেলে বাঁচবে তো?'

হাসিয়া বলিলাম,—'তুমি যে রকম আদর দিচ্ছ, বাঁচা শক্ত।'

সে হঠাৎ লজ্জিত হইয়া পড়িল—'না না, আদর কোথায় দিই। এই তো সেদিন খুব ব'কেছি। সুরমাও খুব শাসন করে।—তা তুমি তোমার ছেলেকে স্কুলে দিচ্ছ কবে?'

'এবার দেব।'

অতঃপর দিন কাটিতেছে। পসার বাড়িয়াছে, সংসারও বাড়িয়াছে; দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। গুরুচরণের কিন্তু সংসার বাড়ে নাই, ঐ এক ছেলে পঙ্কজ। পঙ্কজ কিণ্ডারগার্টেন উত্তীর্ণ হইয়া বড় স্কুলে ঢুকিয়াছে। আমার বড় ছেলে কিণ্ডারগার্টেনে ঢুকিয়াছে। আমরা যৌবনের সীমান্ত ছাড়াইয়া এখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এইবার গুরুচরণের পুত্রপ্রীতির শেষ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

পঙ্কজের বয়স তখন বারো-তেরো বছর। পরীক্ষার দিন আগত। পরীক্ষায় সে প্রতি বছর প্রথম স্থান অধিকার করে, এবারও না করিবার কারণ নাই। আমার ছেলে কানুও বড় স্কুলে ভর্তি হইয়াছে, সেও পরীক্ষা দিবে। কানু একটু ভীরু প্রকৃতির ছেলে, তাই পরীক্ষার প্রথম দিন মোটরে করিয়া তাহাকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলাম।

স্কুলের প্রাঙ্গণে ছেলেদের ভিড়, দশ হইতে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত নানা বয়সের ছাত্র চারিদিকে কিলবিল করিতেছে। তখনও ঘণ্টা বাজে নাই, কিন্তু বাজিতে বেশী দেরিও নাই।

স্কুলের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কানু বলিল,—'বাবা, এবার তুমি যাও।'

তাহাকে সাহস দিবার জন্য পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলাম,—'আচ্ছা। কোথায় সীট পড়েছে খুঁজে পাবি তো?'

'পাব।' সে ছুটিয়া চলিয়া গিয়া অন্য ছেলেদের মধ্যে মিশিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে লক্ষ্য করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া চলিলাম।

এই সময় ফটকের পাশের দিক হইতে চাপা তর্জন শুনিয়া চমকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, গুরুচরণ আর পঙ্কজ। গুরুচরণও পঙ্কজকে স্কুলে পৌঁছাইতে আসিয়াছে। সে বাঁ হতে পঙ্কজের একটা হাত ধরিয়াছে এবং ডান হাতের তর্জনী তুলিয়া বলিতেছে,—'তোকে ফার্স্ট হতে হবে মনে রাখিস। ফার্স্ট হতে হবে—ফার্স্ট হতে হবে—'

পঙ্কজ লজ্জায় লাল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কয়েকটা স্কুলের ছেলে তাহাদের ঘিরিয়া দন্তবিকাশ পূর্বক পঙ্কজের দুর্গতি দেখিতেছে।

গুরুচরণ বলিল,—'ঘণ্টা বাজতে দেরি নেই। শিগ্‌গির আমার পায়ের ধুলো নে, তাহলে নিশ্চয় ফার্স্ট হবি। ফার্স্ট হওয়া চাই—'

পঙ্কজ নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অমনি গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বোধকরি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। ছেলেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এই সময় পঙ্কজ আমাকে দেখিতে পাইয়া করুণ মিনতিভরা চক্ষে আবেদন জানাইল। আমার আর সহ্য হইল না; আমি গিয়া গুরুচরণের হাত ধরিয়া টানিলাম, প্রায় রূঢ়স্বরে বলিলাম,—'এস এস, কী পাগলামি করছ!'

অতঃপর স্কুলে পরীক্ষারম্ভের ঘণ্টা বাজিল, পঙ্কজ দড়ি-ছেঁড়া বাছুরের মত পালাইল। আমি গুরুচরণকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম, তাঁহাকে আমার গাড়িতে তুলিয়া লইয়া গাড়ি চালাইয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম। গুরুচরণ তখনও উত্তেজনায় হাঁপাইতেছে। আমি বেশ বিরক্তভাবেই বলিলাম,—'ছেলেটাকে সহপাঠীদের কাছে অপদস্থ করার দরকার আছে কি?'

গুরুচরণ ব্যাকুল স্বরে বলিল,—'অপদস্থ! তুমি বুঝছ না ডাক্তার, ওকে ফার্স্ট হওয়াই চাই; নইলে সব গণ্ডগোল হয়ে

যাবে। আমি ওর নামে দশ হাজার টাকার ইন্সিওর করেছি, ষোল বছর বয়স থেকে মাসে মাসে টাকা পাবে। নিজে না খেয়ে প্রিমিয়ামের টাকা দিয়েছি। আমি যদি মরে যাই, তবু ওর কলেজে পড়া আটকাবে না।' এই পর্যন্ত বলিয়া সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার কথা ও আচরণের মাথামুণ্ড নাই। কিন্তু ভালবাসা বস্তুটা চিরদিনই মাথামুণ্ডহীন।

মৃত্যু চিন্তা গুরুচরণের মনে লাগিয়া আছে। নিজের স্বাস্থ্যের উপর তাহার ভরসা ছিল না ; বয়স যত বাড়িতেছিল ভরসা ততই কমিতেছিল। তাই সে স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধে যথাশক্তি ব্যবস্থা করিয়াছিল।

তাহার মৃত্যুচিন্তা যে ভিত্তিহীন নয় তাহার প্রমাণ হইল উপরের ঘটনার বছর তিনেক পরে। পঙ্কজ তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। গুরুচরণের হাঁপানির ধাত, জীবনশক্তিও হ্রাস পাইয়াছিল। একদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে অসুখ বাধাইয়া বসিল ; হাঁপানি নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস মিশিয়া এক বিশ্রী ব্যাপার।

কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়া দেখিলাম গতিক ভাল নয়। আমি প্রত্যহ অবসর পাইলেই তাহাকে দেখিয়া আসি ; একদিন সকালে তাহাকে দেখিয়া ফিরিতেছি, সুরমা সদর দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসিল। আমি রাস্তায় নামিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার নিরুদ্বেগ চোখে প্রশ্ন রহিয়াছে। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—'পঙ্কজকে আনিয়ে নিলে ভাল হয়।'

সে আরও কিছুক্ষণ প্রশ্নভরা চোখে চাহিয়া রহিল, তারপর আমার কথার মর্মার্থ যেন বুঝিয়াছে এমনিভাবে একটু ঘাড় নাড়িল।

চলিয়া আসিলাম। সুরমার সহিত আমি কতবার কথা বলিয়াছি—হিসাব করিলে বোধহয় আঙুলে গোনা যায়। আন্দাজ কুড়ি বছর পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিতেছি। আমার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ, সুরমার বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি।

পরদিন গুরুচরণের অবস্থা একটু ভাল মনে হইল। শ্বাসকষ্ট আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম। পিঠের নীচে বালিশ দিয়া বিছানায় অর্ধশয়ান ছিল ; আমাকে দেখিয়া বালিশের পাশ হইতে চশমা লইয়া পরিধান করিল, তারপর বিছানায় হাত চাপড়াইয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। আমি বসিলাম। সুরমা দ্বারের কাছে কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি এবং গুরুচরণ যখন একত্র থাকি তখন সে কাছে আসে না, কথাও বলে না।

গুরুচরণ দু'চারবার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে কথা বলিল। কথা বলিবার তড়বড়ে ভঙ্গী আর নাই, কণ্ঠস্বর বসিয়া গিয়াছে ; কঙ্কালসার মুখে হাসি আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে বলিল,— 'ডাক্তার, এ যাত্রা আর রক্ষে পাব না মনে হচ্ছে—'

আমি আশ্বাস দিতে গেলাম, সে হাত নাড়িয়া আমাকে নিবারণ করিল—'যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয় তুমি খোকা আর সুরমাকে দেখো ; ওরা যেন কষ্ট না পায়। তোমাকেই ওদের গার্জেন করে গেলাম।'

আমার বুকের ভিতরটা চমকিয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলাম,—'কি মুশকিল, এখন ওসব কথা কেন? আগে তুমি সেরে ওঠো—'

সে বলিল,—'এখনি এসব কথা বলা দরকার। যদি না বাঁচি। টাকার জন্যে ভাবনা নেই, সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি শুধু ওদের অভিভাবক থাকবে।'

আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু আমাকে কেন? পঙ্কজের মামারা রয়েছেন—'

সে বলিল,—'মামাদের অনেক ছেলেপিলে, সেখানে খোকা আদর পাবে না। ওরা এই বাড়ীতে থাকবে, তুমি ওদের দেখবে।'

'কিন্তু—' আমি তাহার মুখের পানে চোখ তুলিলাম। পুরু চশমার ভিতর দিয়া সে একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছে। চোখা-চোখি হইলে সে আস্তে আস্তে বলিল,—'ডাক্তার, আমি জানি।'

তাহার অপলক চোখের সামনে আমাকে চক্ষু নত করিতে হইল। দ্বারের দিকে চাহিলাম। সুরমা শান্ত অবিচলিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে, কেবল তাহার গণ্ড বহিয়া নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

ষোল বছর পূর্বের একটা রাত্রির দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সেই অন্ধ ঝড়ের রাত্রি। সে রাত্রিতে সুরমার সহজসিদ্ধ শান্ত সংযমের বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গিয়াছিল।

সারাদিন দুঃসহ গরম গিয়াছে। আশা করিয়াছিলাম অপরাহ্ণে কালবৈশাখী উঠিবে, কিন্তু উঠিল না। কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল না, কম্পাউণ্ডার সন্ধ্যার পর চলিয়া গেল।

সাড়ে সাতটার সময় ভৃত্য পদ্মলোচন বলিল, সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, ছুটি চাই। ছুটি দিলাম। আমার সংসারে পদ্মলোচন ছাড়া আর কেহ ছিল না, তখন আমি অবিবাহিত। পদ্মলোচন সাড়ে আটটার সময় আমার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আমি একা। ন'টার সময় সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি আহারে বসিলাম।

আহার করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, এক পাল পাগলা হাতীর মত মড়মড় শব্দ করিয়া ঝড় আসিতেছে। আমি আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে ঝড় আসিয়া আমার বাড়ীর উপর ঝাঁপাইয়া

পড়িল, বাড়ীর খোলা জানালাগুলো দড়াম দড়াম শব্দে আছাড় খাইতে লাগিল। ছুটিয়া গিয়া জানালাগুলো বন্ধ করিলাম।

ঝড়ের মাতন ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিকে রৈ-রৈ মচ্‌মচ্‌ মড়মড় শব্দ। 'ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।' আমার বাড়ীটা থাকিয়া থাকিয়া ভিৎ পর্যন্ত দুলিয়া উঠিতেছে। বিদ্যুতের আলো কাঁচের গোলকের মধ্যে শিহরিতে লাগিল।

তারপর আসিল বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ। বজ্রের কড়কড় অট্টহাসি, বৃষ্টির ঝরঝর কান্না। আমি বাড়ীর এঘর-ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; ভয় হইতেছে, বাড়ীটা মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে নাকি?

পরে আবহ মন্দিরের বিবরণে জানা গিয়াছিল, এমন দুরন্ত সাইক্লোন চল্লিশ বছরের মধ্যে আসে নাই। নব্বই মাইল বেগে বায়ু বহিয়াছিল, শহরের টিনের এবং খোলার চাল সমস্ত উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, দশ-বারোজন লোক মারা পড়িয়াছিল। রাত্রি সাড়ে ন'টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ঝড়ের এই প্রলয়ঙ্কর মাতামাতি চলিয়াছিল।

দশটা বাজিয়া গিয়াছে। দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু খড়খড়ির ফাঁকে বাহিরের বাতাস আসিয়া বাড়ীটাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া একটা ডাক্তারি বইএর পাতা উল্টাইতেছি, কিন্তু মন এবং কান বাহিরের দিকে পড়িয়া আছে।

এক ঝলক বিদ্যুৎ, সঙ্গে সঙ্গে বিকট বাজ পড়ার শব্দ। খুব কাছে কোথাও বাজ পড়িয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

বাজ পড়ার পর কিছুক্ষণ ঝড়ের শব্দ যেন নিস্তেজ হইয়া গেল। এই সময়—ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌। কে যেন আমার সদর দরজায় ধাক্কা দিতেছে।

এই ঝড়ের রাত্রে কে আসিল! রোগী? কিংবা পাড়ার কেহ

জখম হইয়াছে! কান পাতিয়া রহিলাম। পদ্মলোচন কি ফিরিয়া আসিল? না, ঝড় না থামিলে সে ফিরিবে না—

আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ। উঠিয়া গিয়া সন্তর্পণে হুড়কা খুলিলাম। কিন্তু বাতাসের ঠেলায় দরজা আমার হাত ছিনাইয়া সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল—সুরমা!

আমি প্রাণপণ শক্তিতে দরজা আবার বন্ধ করিয়া দিলাম। সুরমার দিকে ফিরিয়া দেখিলাম সে ভিজা কাপড়ে অসম্বৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; চোখে ভয়ার্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি। আমি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম, মুখ দিয়া বাহির হইল,—'এ কি! ব্যাপার কি?'

তাহার ঠোঁট খুলিয়া গিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—'রান্নাঘরের চালা উড়ে গেছে। তারপর দক্ষিণ দিকের নারকেল গাছে বাজ পড়ল। বাড়িতে আমি একা—'

'গুরুচরণ কোথায়?'

'সন্ধ্যের ট্রেনে কলকাতা গিয়েছে—'

এই সময় বজ্র আর একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল। সুরমা দু'হাতে কান ঢাকা দিল, তারপর বলিল,—'পৃথিবী কি উল্টে যাবে?'

বলিলাম,—'তুমি বড় ভয় পেয়েছ। এস, ওষুধ দিচ্ছি।'

ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহাকে এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইয়া দিলাম। তারপর তাহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বলিলাম,—'তুমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাক, ভয় কেটে যাবে। আমি বাইরের ঘরে আছি।'

এই সময় হঠাৎ দপ করিয়া আলো নিভিয়া গেল। সুরমা আর্ত কাতরোক্তি করিয়া অন্ধকারে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে খামচাইয়া ধরিল।...

ভগবান জানেন, দুরভিপ্রায় আমাদের কাহারও মনে ছিল না। যোগাযোগ দেখিয়া মনে হয় যেন দুইজন অতি সামান্য নরনারীর অযাচিত মিলন ঘটাইবার জন্য সে রাত্রে নিয়তি এমন বিপুল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু সে যাক। নিয়তির অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিব না। এবং নিজের দুর্বলতার দায় নিয়তির ঘাড়ে চাপাইয়া সাধু সাজিবারও ইচ্ছা নাই।

সুরমাকেও আমি বিচার করিব না। চিরদিন তাহার যে শুদ্ধ-শান্ত রূপ দেখিয়াছি তাহা তাহার ছদ্মবেশ, একথা স্বীকার করি না। ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতির শান্ত নিরুদ্বেগ অন্তরে অলক্ষিতে যেমন ঝড়ের বাষ্প জমিয়া জমিয়া একদিন বিস্ফোরণের আকারে ফাটিয়া পড়ে, তেমনি মানুষের অন্তরেও যে অনুরূপ ব্যাপার ঘটে না তাহা কে বলিতে পারে।

সে রাত্রে ঝড় থামিবার পর রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় সুরমা গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। তারপর—তারপর—

পঙ্কজ আমার ছেলে। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছি সেইদিন হইতে জানি সে আমার ছেলে।

মৃত্যুশয্যায় শুইয়া গুরুচরণ হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কথা বলিতেছে। আমি শয্যার পাশে বসিয়া শুনিতেছি। সুরমা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে।

'—খোকার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম···সুরমাও অস্বীকার করেনি ··কয়েক মাস বড় অশান্তিতে কেটেছিল···ভেবেছিলাম···ওদের ত্যাগ করব···কিন্তু ত্যাগ করতে গিয়ে দেখলাম খোকাকে ছেড়ে আমি মরে যাব।—সুরমা খোকাকে আসতে লিখেছ? মরার আগে তাকে দেখতে পাব তো? ··'

এ কাহিনী কোথায় শেষ করিলে ভাল হয় জানি না। ইহার কি শেষ আছে? আমি যখন থাকিব না, সুরমা যখন থাকিবে না, হয়তো তখনও এ কাহিনীর রেশ চলিতে থাকিবে। সুতরাং এখানেই ছেদ টানা ভাল।

আদিম

এই কাহিনীতে আদৌ স্থান কাল পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।—

মহারাজ সূর্যশেখর শত্রু জয় করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়াছেন। মরুভূমির পরপারে নির্জিত শত্রু মাথা নত করিয়াছে। মহারাজ সূর্যশেখর সহস্র বন্দী ও সহস্র বন্দিনী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও আছে, আবার অভিজাত বংশের যুবক-যুবতীও আছে। বড় সুন্দর আকৃতি এই বন্দী-বন্দিনীদের; রজতশুভ্র দেহবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশ। যুবতীদের দিকে একবার চাহিলে চোখ ফেরানো যায় না।

মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন, একশত বন্দী ও একশত বন্দিনী তিনি স্বয়ং বাছিয়া লইবেন; বাকি যাহা থাকিবে, প্রধান সেনাপতি হইতে নিম্নতম নায়ক পর্যন্ত সকলে পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করিয়া লইবে। উপরন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্ন যাহা সঙ্গে আসিয়াছে তাহাও ভাগ-বাঁটোয়ারা হইবে।

একদিন অপরাহ্ণে উত্তরায়ণের সূর্য মরুপ্রান্তর প্রজ্জ্বলিত করিয়া অস্তোন্মুখ হইয়াছে এমন সময় বিজয় বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পুরোভাগে মহারাজ সূর্যশেখরের চিত্রবিচিত্র শ্যেনলাঞ্ছন চতুর্দোলা, তাহার পশ্চাতে শিবিকা ও দোলিকায় সেনাপতির দল, তারপর বন্দী-বন্দিনীর শ্রেণী এবং লুণ্ঠিত ধনরত্নবাহী যানবাহন। সর্বশেষে বিপুল সৈন্যবাহিনী।

কিন্তু আজ আর সদলবলে পুরপ্রবেশের সময় নাই; মহারাজ স্বনির্বাচিত বন্দী-বন্দিনীদের লইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ

করিলেন। সেনাপতিরাও নগরে যাইতেছেন; তাঁহারা কাল প্রাতে আসিয়া বন্দী-বন্দিনী বাছাই করিয়া লইয়া যাইবেন। কেবল সৈন্যদল ধনরত্ন ও বন্দী-বন্দিনীদের রক্ষকরূপে রহিল। কাল প্রাতে ধনরত্ন ভাগ হইবে, সৈনিকেরা যে-যার অংশ লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিবে।

একজন কনিষ্ঠ সেনানীর নাম সোমভদ্র। বয়স একুশ বাইশ, বলিষ্ঠ দেহ, তাম্রফলকের ন্যায় দেহবর্ণ; সুন্দর আকৃতি। রাজধানীতেই তাহার গৃহ, তাহার পিতা একজন মধ্যশ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থ। সোমভদ্র এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল; যুদ্ধে সে অসীম পরাক্রম দেখাইয়াছে, প্রধান সেনানায়কদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, মহারাজের ভীমকান্ত মুখের প্রসন্ন হাস্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আজ গৃহের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া যখন সকলের মন গৃহের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তখনও তাহার প্রাণে শান্তি নাই। গৃহের কথা স্মরণ হইলেই তাহার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। গৃহে পিতামাতা আছেন, কনিষ্ঠা ভগিনী শফরী এবং বালক-ভ্রাতা শ্যেনভদ্র আছে; ক্ষুদ্র সংসার। কিন্তু সোমভদ্রের সবচেয়ে ভয় শফরীকে। শফরী শুধুই তাহার অনুজা নয়—

উদ্‌ভ্রান্তভাবে সৈন্য সমাবেশের প্রান্তভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে সোমভদ্র গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। সৈন্যদল শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাহাদের মনে চিন্তা নাই; তাহারা উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতেছে, নিজেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি করিতেছে। কাল প্রাতে তাহারা বেতন পাইবে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবে; হয়তো দুই একটি দাসদাসী পাইবে, তারপর মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সোমভদ্রের অবস্থা অন্যরূপ; তাহার মন দুইদিকে

টানিতেছে। সম্মুখে নীয়মান পতাকার ন্যায় তাহার মন পিছনদিকে তাকাইয়া আছে।

শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিবার পথে সহস্র বন্দিনীর মধ্যে একটি বন্দিনীর কাছে সোমভদ্র হৃদয় হারাইয়াছে। ইহা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণ নয়, গভীরতর বস্তু। বন্দিনীর নাম মেরুকা; শুভ্রশিখা দীপবর্তিকার ন্যায় তার রূপ, বন্দিনীর ছিন্ন-গলিত বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া রূপশিখা স্ফুরিত হইতেছে। নীল চোখে কঠিন সহিষ্ণুতা। সে উচ্চবংশের কন্যা, দৈবনিগ্রহে বিজাতীয় শত্রুর কবলিত হইয়া স্বজন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত, পৃথিবীতে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; সে এখন নির্মম শত্রুর পণ্যবস্তু। কিন্তু এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও মেরুকা মনের স্থৈর্য হারায় নাই।

বন্দিনীদের মধ্যে সুন্দরী অনেক আছে, সকলেই সুন্দরী ও যুবতী; কারণ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতীদেরই হরণ করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু সোমভদ্র একমাত্র মেরুকাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে দুজনে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে; চেনাশোনা হইয়াছে, দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত কথার বিনিময় হইয়াছে, দুজনে পরস্পরের নাম জানিয়াছে, অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত জানিয়াছে। সোমভদ্র কিন্তু নিজের মনের কথা মেরুকাকে বলে নাই; বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সোমভদ্রের চোখের ভাষা মেরুকা বুঝিয়াছে।

কিন্তু আজ যাত্রাপথের প্রান্তে পৌঁছিয়া আর নীরব থাকা চলে না, মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাই সোমভদ্রের মন এত বিভ্রান্ত। হৃদয়ে আবেগ আছে, শান্তি নাই। পথের প্রান্তে নয়, সে যেন দ্বিভুজ পথের কোণবিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সেনাপতিরা সকলে চলিয়া গিয়াছেন। সূর্য অস্তগামী; সৈনিকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রাত্রির আহারের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। সোমভদ্রের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। সে সহসা মনস্থির করিয়া বন্দিনীদের সাময়িক উপনিবেশের দিকে চলিল।

বন্দী ও বন্দিনীদের পৃথক অবরোধ। সৈন্যযূথের বিশ্রাম কালে দোলা-শকটাদি বাহনগুলিকে পর পর সাজাইয়া দুইটি পরিবেষ্টন নির্মিত হয়, একটিতে বন্দিগণ ও অপরটিকে বন্দিনীগণ থাকে। এই শকট-ব্যূহের মধ্যে রাজা ও দুই তিনজন প্রধান সেনাপতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সোমভদ্র শকট-ব্যূহের বহির্দেশ ঘিরিয়া ধীর পদে পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। কাহারও চোখে আতঙ্ক, কাহারও চোখে নীরব অশ্রুর ধারা। কেহ বা নিয়তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়া উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও দৃষ্টি সম্মুখে ভীম নগর-তোরণের উপর নিবদ্ধ, কাহারও চক্ষু পশ্চাতে অদৃশ্য মাতৃভূমির দিকে প্রসারিত। তাহাদের সম্মিলিত মনের নিপীড়িত আকাঙ্ক্ষা কে নির্ণয় করিবে?

আবেষ্টনীর পশ্চাদ্ভাগে মেরুকা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি সম্মুখেও নয়, পশ্চাতেও নয়; মনে হয় আপন মনের গহন জটিলতার মধ্যে তাহার চক্ষু দুটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সোমভদ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল; মাঝখানে একটি শকটের ব্যবধান। কিন্তু মেরুকা তাহাকে দেখিতে পাইল না। সোমভদ্র কিয়ৎকাল একাগ্র চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল—"মেরুকা!"

চকিতে মেরুকার চক্ষু বহির্মুখী হইল। সে ক্ষণকাল স্তিমিত নেত্রে সোমভদ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, 'সেনানী সোমভদ্র!'

শকটের উপর ঝুঁকিয়া সোমভদ্র প্রশ্ন করিল—'মেরুকা, তুমি কি ভাবছিলে?'

মেরুকা আকাশের পানে চাহিল। এক ঝাঁক পাখি কলকূজন করিয়া বাসায় ফিরিতেছে। মেরুকা ধীরে ধীরে বলিল—'কি ভাবছিলাম জানি না। বোধ হয় নিজের নিয়তির কথা ভাবছিলাম।'

উদ্গত আবেগ দমন করিয়া সোমভদ্র কহিল, 'মেরুকা, তুমি আশা হারিও না।'

মেরুকা বলিল—'যেদিন বন্দিনী হয়েছি সেদিন থেকে আশা আশঙ্কা দুই-ই ত্যাগ করেছি। শুধু ভাবি, আমার নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের মুখে মরুভূমির বালুকণা কোন্ সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে।'

তাহার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে যে অপরিসীম হতাশা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সোমভদ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল; সে মেরুকার পানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবেগ-স্খলিত স্বরে বলিল—'মেরুকা, তুমি আমার ভগিনী! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া মেরুকা বলিল—'ভগিনী! তোমাদের দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হয়! আমাদের দেশে হয় না। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা নও, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, আমি স্বর্গ হাতে পাব।'

মেরুকার শুষ্ক চক্ষু সহসা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, সে সোমভদ্রের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। শকটের দুই পার হইতে আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হইল।

সোমভদ্র বলিল—'আমি কাল প্রত্যূষে আসব। একটি বন্দিনী আমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে বেছে নেব, তারপরে বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

মেরুকার অধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কথা বলিতে পারিল না, কেবল দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে সোমভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সোমভদ্র যখন নিজ গৃহের সম্মুখীন হইল সূর্য অস্ত গিয়াছে, অদূরস্থ নদীর নিস্তরঙ্গ নীল জলে অস্তরাগের খেলা চলিতেছে। গৃহ-প্রাঙ্গণের দ্বারে তাহার পিতা মাতা, ভগিনী শফরী ও বালক ভ্রাতা শ্যেনভদ্র দাঁড়াইয়া। সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে সোমভদ্রের উপর পড়িল। মায়ের মুখে হাসি, চোখে জল; পিতার মুখ তৃপ্তি-গম্ভীর। শ্যেনভদ্র ছুটিয়া দাদার কাছে যাইবার উপক্রম করিলে পিতা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিলেন। কেবল শফরীকে কেহ আটকাইল না। সোমভদ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার অগ্রাধিকার তাহারই।

শফরীর বয়স সতরো। রূপ ও যৌবন মিলিয়া সাবলীল স্বর্ণাভ শফরীর মতই তাহার দেহ। সে লঘুপদে ছুটিয়া গিয়া সোমভদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গ্রীবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গদগদ স্বরে ডাকিল—'ভাই!'

ক্ষণকালের জন্য সোমভদ্রের মনে হইল, তাহার সন্তাপ শান্ত হইয়াছে, অঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে, দেহমন ভরিয়া একটি পরিতৃপ্ত আনন্দ সুগন্ধি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে শফরীর স্কন্ধ জড়াইয়া লইল।

শফরী মুখ তুলিল। দুই চক্ষে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া সোমভদ্রের অধরের কাছে অধর ধরিল। বলিল—'চুমু খাও।'

সোমভদ্রের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। শফরীকে বলিতে হইবে, মেরুকার কথা বলিতে হইবে। সে শফরীর অধরে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল—'শফরি, তুমি ভাল আছ?'

শফরী বলিল—'উঃ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে!'

সোমভদ্র লঘু হাসিয়া বলিল—'যদি না ফিরে আসতাম? যদি যুদ্ধে মরে যেতাম!'

শফরীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বুভুক্ষু চক্ষে কিছুক্ষণ সোমভদ্রের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'তাহলে—তাহলে আমিও মরে যেতাম।'

না, আর নয়, এ প্রসঙ্গ আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সোমভদ্র নিজেকে শফরীর বাহুমুক্ত করিয়া বলিল—'না, তুমি মরে যেতে কেন? কিছুদিন হয়তো আমার জন্য দুঃখ করতে, তারপর অন্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত। শফরী—'

তাহার কথা শেষ হইল না, শ্যেনভদ্র পিতার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া বনবিড়ালের মত তাহার পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িল, হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া তাহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিল। শ্যেনভদ্রের বয়স দশ বছর।

তিনজনে হাসিতে হাসিতে মাতাপিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সোমভদ্র নতজানু হইয়া মাতাপিতাকে অভিবাদন করিল। শফরীর চক্ষু সারাক্ষণ সোমভদ্রের মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সোমভদ্রের আচরণে কোথায় যেন বিকলতা রহিয়াছে, সে তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকে নাই, শফরী বলিয়া ডাকিয়াছে। কেন?—

বাড়ীতে অনাড়ম্বর উৎসবের হাওয়া। প্রাঙ্গনে বাঁধা শ্বেত

গর্দভটি ঘন ঘন কর্ণ আন্দোলিত করিয়া কোমল চক্ষে চাহিয়া সোমভদ্রকে সম্ভাষণ জানাইয়াছে, গরু ছাগল ও মেষ নিজ নিজ ভাষায় সংবর্ধনা করিয়াছে। মা রন্ধনশালাতে গিয়াছেন, শফরী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পিতা প্রীতিবিস্মিত মুখে প্রাঙ্গণ-বেদীর উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল শ্যেনভদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়ে নাই, ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মন আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আহারের সময় সকলে সমবেত হইলে সোমভদ্র তাহার যুদ্ধযাত্রার অনেক বিচিত্র কাহিনী বলিল। সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শুনিল। তারপর মাতা ক্লান্ত সোমভদ্রকে শয়ন করিতে পাঠাইলেন। শ্যেনভদ্র শফরীর কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রালু হইয়াছিল, সে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাতাপিতা ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বিবাহের আলোচনা করিতেছেন। সোমভদ্র ও শফরী বড় হইয়াছে; সোমভদ্র যুদ্ধে কীর্তি অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে, এখন আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই, যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। কালই পিতা মন্দিরে গিয়া পুরোহিতের সহিত দিন ক্ষণ স্থির করিয়া আসিবেন।

শফরী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিল। তাঁহাদের স্বর ক্রমশ গাঢ় ও স্মৃতিমধুর হইয়া আসিল; তখন শফরী শয়ন করিতে গেল। নিজের শয়নকক্ষে যাইবার আগে একবার সোমভদ্রের কক্ষে উঁকি মারিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের নিষ্কম্প শিখা মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে। সোমভদ্র শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার একটি বাহু চোখের উপর ন্যস্ত; নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শফরী চাহিয়া চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। তাহার হৃদয়ে একটি প্রশ্ন

বারংবার কাঁটার মত ফুটিতে লাগিল। কেন? কেন সোমভদ্র তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকিল না? তবে কি সে আর তাহাকে ভালবাসে না? তবে কি?—

শফরী নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। গৃহ নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে, বাহিরে নদীতীরে ক্বচিৎ হংস বা সারসের উচ্চকিত ধ্বনি শুনা যাইতেছে। নগর সুপ্ত, গৃহ সুপ্ত; কেবল শফরী জাগিয়া আছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শফরী উঠিল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে সোমভদ্রের কক্ষের দিকে চলিল। ঘরের কোণে দীপশিখাটি ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে, সোমভদ্র পূর্ববৎ চক্ষের উপর বাহু রাখিয়া শুইয়া আছে। শফরী নিঃশব্দে তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকে দুরন্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমার প্রিয়তম! আমার ভাই! এক রক্ত, এক দেহ; আমরা পরস্পরের হয়ে জন্মেছি, পরস্পরের জন্যে বড় হয়েছি, আমাদের মাঝখানে ব্যবধান নেই। আমরা কি কখনো আলাদা হতে পারি!

শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া শফরী সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে অতি সন্তর্পণে চুম্বন করিল।

সোমভদ্র তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিল, চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

আজ গৃহে ফিরিবার পর হইতে সে সকলের কাছে মেরুকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই; মেরুকার নাম কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। মনে হইয়াছে, মেরুকার নাম উচ্চারণ করিলেই গৃহের এই শান্ত আনন্দময় পরিমণ্ডল চূর্ণ হইয়া যাইবে। সতরো বছর পূর্বে শফরী

যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেইদিন হইতে স্থির হইয়া আছে তাহারা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। দু'জনে একসঙ্গে বড় হইয়াছে, কেহ অন্য কথা ভাবিতেও পারে নাই। তারপর যুদ্ধযাত্রা। কোথা হইতে বন্দিনী মেরুকা আসিয়া তাহার হৃদয় হরণ করিয়া লইল। সোমভদ্র প্রাণমন দিয়া মেরুকাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পর পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া, শফরীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনে অপরাধের গ্লানি আসিয়াছে, মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারে নাই। গৃহে ফিরিয়াই সকলের মনে আঘাত দিতে তাহার মন সরে নাই।

কিন্তু একথা বেশীক্ষণ লুকাইয়া রাখা চলিবে না। কাল প্রাতেই সে মেরুকাকে আনিতে যাইবে; মেরুকাকে লইয়া গৃহে ফিরিবার পর কিছুই আর অজ্ঞাত থাকিবে না। পিতামাতা তখন কি করিবেন, শফরী কি করিবে কিছুই অনুমান করা যায় না। তার চেয়ে আগেই কথাটা জানাইয়া রাখা ভাল। পিতামাতা যদি অমত করেন তখন মেরুকাকে লইয়া সে অন্যত্র ঘর বাঁধিবে। তাহার অর্থের অভাব নাই; সে যোদ্ধা, যুদ্ধে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, অর্থও প্রচুর অর্জন করিবে—

তবু সে বলিতে পারে নাই। বিক্ষুব্ধ মন লইয়া সে শয়ন করিতে গিয়াছিল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে সে পিতামাতা ও শফরীর সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, স্বপ্নে মেরুকাকে ভগিনী বলিয়া চুম্বন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এইভাবে অর্ধেক রাত্রি কাটিয়াছে।

শফরীর চুম্বনে ঘুম ভাঙিয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখের জড়িমা দূর হইলে দেখিল, মেরুকা নয়, শফরী। তাহার মন অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ হইল। শফরী একাকিনী, তাহাকে সে সব

কথা বলিতে পারিবে। শফরীর সহিত তাহার মনের একটি সংযোগ আছে, নাড়ীর যোগ, শফরী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। তাহাকে মেরুকার কথা বলিলে সে বুঝিবে।

সোমভদ্র শফরীর হাত ধরিয়া তাহাকে শয্যার পাশে বসাইল, চুপি চুপি বলিল,—'শফরী, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

শফরী তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—'কি কথা?'

প্রায় আলিঙ্গনবদ্ধভাবে বসিয়া দু'জনের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে কথা হইতে লাগিল। জোরে কথা বলিলে মা-বাবার ঘুম ভাঙিয়া যাইতে পারে।

সোমভদ্র বলিল,—'আমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। কী সুন্দর মেয়ে, একবার দেখলে তুইও ভালবেসে ফেলবি।'

সোমভদ্রের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শফরীর দেহ শক্ত হইয়া উঠিল, —'কে সে?'

সোমভদ্র বলিল,—'তার নাম মেরুকা, যাদের আমরা যুদ্ধে বন্দিনী করে এনেছি তাদেরই একজন। বন্দিনী হলেও উঁচু ঘরের মেয়ে। আমি তাকে বোন বলে ডেকেছি, তাকেই বিয়ে করব।'

শফরীর মেরুযষ্টি লৌহশঙ্কুর ন্যায় ঋজু হইয়া রহিল, সে ধীরে ধীরে বলিল,—'তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে তো তোমার সত্যিকার বোন নয়।'

সোমভদ্র বলিল,—'নাই বা হল সত্যিকার বোন। যার সঙ্গে ভালবাসা হয় সেই তো বোন। ভেবে ছ্যাখ, যার সত্যিকার বোন নেই তার কী হয়? সে তো বাইরের মেয়েকে বিয়ে করে। আমিও তেমনি বাইরের মেয়েকে বিয়ে করব।'

শফরীর জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল,—'কিন্তু ওর তো ঘর নেই। ওকে নিয়ে তুমি যাবে কোথায়?"

'অবশ্য স্ত্রীর ঘরেই স্বামীকে যেতে হয়। কিন্তু ওর যখন ঘর নেই তখন বাবাকে বলব এই বাড়ীতেই আমাদের স্থান দিতে। তা যদি তিনি না দেন তখন আলাদা ঘর বাঁধব।'

'আর আমি? আমার কি হবে?' কথাগুলি শফরী অতিকষ্টে কণ্ঠ হইতে বাহির করিল।

সোমভদ্র তাহার কণ্ঠস্বরের মর্মান্তিক শুষ্কতা লক্ষ্য করিল না, সাগ্রহে বলিল,—'তুইও আমার মতন বাইরে বিয়ে করবি। শাস্ত্রে বলেছে মাঝে মাঝে বাইরে বিয়ে করতে হয়, নইলে বংশের অধোগতি হয়। কিন্তু তুই যদি নিতান্তই বাইরের মানুষকে ঘরে না আনতে চাস—তাহলে শ্যেনভদ্র তো রয়েছে! দু'চার বছরের মধ্যে ও জোয়ান হয়ে উঠবে—'

শফরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি যদি বিয়ে না করি তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর।—আচ্ছা, এবার ঘুমোও।'

সোমভদ্র তাহার হাত টানিয়া বলিল,—'আমি ভোর না হতেই চলে যাব মেরুকাকে আনতে। মা-বাবাকে তুই কথাটা শুনিয়ে রাখিস।'

'আচ্ছা—' শফরী তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। সোমভদ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আবার শয়ন করিল। এ ভালই হইল। পিতামাতাকে নিজের মুখে কিছু বলিতে হইবে না।

শফরী নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল, অনেকক্ষণ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মন বুদ্ধি অবশ হইয়া গিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; তখন সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তাহার হৃদয় হিংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাকার একটা ঘৃণ্য

বিজাতীয়া বন্দিনী রূপের লোভ দেখাইয়া তাহার ভাইকে ভুলাইয়া লইবে। না না, আমি দিব না। আমার ধন দিব না, তার চেয়ে—

শয্যা হইতে উঠিয়া শফরী দেওয়ালের কুলঙ্গী হইতে একটি শল্য তুলিয়া লইল। পিত্তল নির্মিত তীক্ষ্ণধার শল্য; শফরীর পিতা একজন অতি নিপুণ ধাতুশিল্পী, তিনি এই শল্যটি স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন। শফরী শল্যটির সূক্ষ্ম অণি নিজের বুকের মাঝখানে ফুটাইয়া পরখ করিল, তারপর আবার শয্যার আসিয়া বসিল।

সোমভদ্র নিজ শয্যায় ঘুমাইতেছে। তাহার মন ওই মায়াবিনী রাক্ষসীর রূপে নিমজ্জিত হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। কাল সকালেই সে রাক্ষসীকে আনিতে যাইবে। না না, তার পূর্বেই—। সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে, যেখানে সে চুম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেইখানে এই শল্য বসাইয়া দিবে; তারপর শল্য নিজের বুকে বিঁধিয়া দিয়া দু'জনে একসঙ্গে পরলোকে যাইবে। জন্মাবধি যে বন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল, মৃত্যুর পরও তাহা ছিন্ন হইবে না। একই তরণীতে হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা মৃত্যু-নদীর খরস্রোত পার হইবে।

শফরী দৃঢ়মুষ্টিতে শল্য ধরিয়া সোমভদ্রের শয্যাপাশে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিশ্চিন্ত নিদ্রিত মুখের পানে চাহিল। সহসা অদম্য রোদনের বেগ তাহার বক্ষ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া সে ফিরিয়া গেল, নিজের শয্যায় পড়িয়া অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দিল। না, সোমভদ্রের বুকে সে শল্য বিঁধিতে পারিবে না।

শুইয়া শুইয়া অসহায়ভাবে সে মেরুকাকে গালি দিতে লাগিল— রাক্ষসী! পিশাচী! ডাকিনী!—পিশাচী! রাক্ষসী! ডাকিনী!

নদীতীর হইতে একটা সারসের কেংকার ভাসিয়া আসিল। শফরীর মনে হইল, সারস বলিল—ডাকিনী !

ডাকিনী ! এতক্ষণ শফরীর স্মরণ ছিল না, নদীতীরে শর-কাণ্ডের কুটীরে এক ডাকিনী বাস করে। ডাকিনী তন্ত্রমন্ত্র জানে, মারণ বশীকরণ জানে। শফরী নদীতীরে তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছে, দু'একবার কথাও বলিয়াছে, শীর্ণ কৃষ্ণকায়া বিকট-দশনা বৃদ্ধা, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাস করে। কিন্তু রাত্রে তাহার কাছে লোক আসে, যাহারা মন্ত্রৌষধির বলে গোপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চায় তাহারা অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি ডাকিনীর কাছে আসে।

শফরী ক্ষণকাল নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইল। তীক্ষ্ণ শল্যটি বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইল। সে ডাকিনীর কাছে যাইবে, ডাকিনীর মন্ত্রবলে শত্রু নিপাত করিবে।

গৃহ হইতে অল্প দূরে শরবনের মধ্যে ডাকিনীর কুটীর; কুটীরের মাঝখানে মাটির উপর অঙ্গার কুণ্ড। কিন্তু অঙ্গারের রক্তাভ আলোকে কুটীরের মধ্যে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

শফরী শঙ্কিত বক্ষে দ্বারের বাহিরে কিয়দ্দূরে আসিয়া দাঁড়াইল; বেশী কাছে যাইতে ভয় করে। সে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল,—'ডাকিনি!'

যেন মন্ত্রবলে ডাকিনী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; বিকট হাসিয়া বলিল,—'বিদেশিনী তোর ভাই-এর মন কেড়ে নিয়েছে, তাই এসেছিস?'

শফরী ভয় ভুলিয়া গেল, ডাকিনীর হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিল,—'হ্যাঁ ডাকিনি, তুই আমার ভাইকে ফিরিয়ে দে।'

ডাকিনীর আঙুলে দীর্ঘ নখ, সে নখযুক্ত আঙুল শফরীর মুখে বুলাইয়া বলিল,—'ভাই ওমনি পাওয়া যায় না। কি দিবি ?'

শফরী বলিল,—'তুই যা বলবি তাই দেব।'

'বুকের রক্ত দিতে পারবি ?'

'পারব।'

'তবে তাই দে।' বলিয়া ডাকিনী শফরীর বুকের সামনে নিজ করতল গণ্ডূষ করিয়া ধরিল।

শফরী শল্য বাহির করিয়া নিজের বুকে আঁচড় কাটিল, দরদর করিয়া রক্ত ডাকিনীর গণ্ডূষে পড়িতে লাগিল। গণ্ডূষ পূর্ণ হইলে ডাকিনী বলিল,—'এতেই হবে। তুই দাঁড়া, আমি আসছি।'

সে কুটীরে প্রবেশ করিল। শফরী রক্তক্ষরিত বক্ষে বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অঙ্গার-কুণ্ডের সম্মুখে নতজানু হইয়া ডাকিনী পূর্ণ করতল আগুনের উপর উপুড় করিয়া দিল। অগ্নি ক্ষণকাল স্তিমিত হইয়া রহিল, তারপর দপ্ করিয়া শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ডাকিনী তখন মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বামাবর্তে অগ্নি পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শফরী কম্প্রবক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

অগ্নিশিখা প্রশমিত হইলে ডাকিনী ধুনী হইতে এক টিপ ভস্ম লইয়া শফরীর কাছে ফিরিয়া আসিল, বলিল,—'ভয় নেই, ভাইকে ফিরে পাবি। বিদেশিনী তোর ভাইকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

রুদ্ধশ্বাসে শফরী বলিল,—'পারবে না ?'

'না, আমার মন্তর মিথ্যে হয় না!—এই ভস্ম বুকের কাটায় লাগিয়ে দে, কাটা জুড়ে যাবে।'

ভস্ম লইয়া শফরী বুকে মাখিল ; মনে হইল ভস্ম নয়, চন্দন। ডাকিনী তখন বলিল,—'এবার আমায় কি দিবি বল।'

'তোমায় কী দেব ?' ডাকিনীকে শফরীর অদেয় কিছুই ছিল না, কিন্তু সঙ্গে যে কিছুই নাই! সে অমূল্য শল্যটি ডাকিনীর হাতে দিয়া বলিল,—'এই নাও। আমার বাবা আমার জন্যে নিজের হাতে গড়ে দিয়েছেন, সারা দেশে এর জোড়া নেই।'

'দে দে—' শল্য লইয়া ডাকিনী কুটীরে ফিরিয়া গেল। শফরী দেখিল, সে শল্যটি আগুনের কাছে ধরিয়া লোলুপ চক্ষে দেখিতেছে এবং শিশুর মত খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

টলমল উদ্বেল হৃদয়ে শফরী গৃহে ফিরিয়া গেল। আশার উৎ-কণ্ঠায় সারা রাত্রি শয্যায় পড়িয়া জাগিয়া রহিল।

বন্দিনীদের অবরোধে মেরুকাও সারা রাত্রি ঘুমায় নাই। ঊষার উদয়ে সোমভদ্র আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে। গৃহ-হীনা বন্দিনী গৃহ পাইবে, স্বামী পাইবে, মেষ-ছাগের মত দাসীহাটে বিক্রীত হইতে হইবে না। তাই আশার উৎকণ্ঠায় তাহার চোখে ঘুম নাই।

ঊর্ধ্বে নক্ষত্রগুলি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল, আকাশের অগ্নিকোণে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হইলে নদীতে জল বাড়ে, সেই নক্ষত্রটি দপদপ করিতে লাগিল। ক্রমে সে নক্ষত্রটিও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল ; প্রত্যূষের ধূসর আলো অলক্ষিতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

সোমভদ্র কিন্তু আসিল না। মেরুকার ব্যাকুল চক্ষু নগর-দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে—ঐ বুঝি সে আসিতেছে! ঐ বুঝি সোমভদ্র!

কিন্তু না, যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে সোমভদ্র নাই। অন্যান্য সেনাপতিরা আসিতেছেন, তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া বাছাই করিয়া নির্ধারিত সংখ্যক বন্দি-বন্দিনী লইয়া যাইবেন। সকলের সঙ্গে বহু সশস্ত্র রক্ষী।

সূর্যোদয় হইলে সেনাপতিরা বন্দিনীদের অবরোধে প্রবেশ করিলেন। আর আশা নাই! মেরুকার বুক ফাটিয়া নিঃশ্বাস বাহির হইল। যুদ্ধে বন্দিনী ক্রীতদাসীর ভাগ্য এত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইবে, ইহা সে কেমন করিয়া আশা করিয়াছিল? ছিন্নমূল লতায় কি ফুল ফোটে!

মেরুকা মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিল। একজন মাংসলোলুপ সেনাপতি তাহাকে লইয়া যাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ হইলে তিনি তাহাকে দাসীহাটে বিক্রয় করিবেন। কোনও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তাহার ক্লান্ত-যৌবন দেহটা ক্রয় করিবে। আবার কিছুকাল পরে সেও তাহাকে কোনও দরিদ্র কৃষকের কাছে বিক্রয় করিবে। তারপর একদিন তাহার ভগ্ন জীর্ণ দেহটা নদীর গর্ভে সমাধি লাভ করিবে। ইহাই তাহার জীবনের সুনিশ্চিত পরিণাম।

অমোঘভল্ল নামক এক সেনাপতি মেরুকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স অনুমান চল্লিশ, দৃঢ় গঠন, মাংসল দেহ, ললাটে গভীর অস্ত্রক্ষত চিহ্ন, চক্ষে কর্তৃত্বের অভিমান। আঠারো বছর হইতে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, জীবনে সারবস্তু কেবল দুইটি আছে: শত্রুর শোণিত এবং নারীর যৌবন। মেরুকার দেহ নিরাবরণ করিয়া তিনি ভোগপ্রবীণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'নাম কি?'

তুষারশীতল কণ্ঠে মেরুকা নাম বলিল।

অমোঘভল্ল প্রশ্ন করিলেন, 'হাসতে জানো?'

অন্তরে বিদ্বেষের তুষানল জ্বালিয়া মেরুকা দশনপ্রান্ত উন্মোচিত করিয়া মুখে হাসির ভঙ্গিমা করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্ল সন্তুষ্ট হইলেন। মেরুকার কণ্ঠস্বর মিষ্ট, দন্তপংক্তি সুন্দর। তিনি দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'একে আমার প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাও।'

মেরুকা একবার চোখ তুলিয়া মহানায়ক অমোঘভল্লের পানে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে দুই ভৃত্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্যেরা তাহার দেহে একখণ্ড লঘু উত্তরীয় জড়াইয়া দিল।

সোমভদ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শফরীর সহিত কথা বলিবার পর তাহার মন নিরুদ্বেগ হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। একেবারে ঘুম ভাঙ্গিল যখন সূর্যোদয় হইতেছে। সে কিছুক্ষণ জড়বৎ বসিয়া রহিল, তারপর স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিলে মুখে অব্যক্ত শব্দ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যদ্বয় মেরুকাকে দোলায় তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সোমভদ্র সৈন্যব্যূহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

'মেরুকা!'

মেরুকা উচ্চকিত হইয়া দেখিল সোমভদ্র ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। তাহার অন্তরের সমস্ত হতাশা কঠিন-তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হইল, চক্ষু হিমশীতল উপলখণ্ডের ন্যায় নিষ্প্রাণ হইয়া

গেল। সে সোমভদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া দোলায় আরোহণের উপক্রম করিল।

সোমভদ্র ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, 'মেরুকা! তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যেরা সোমভদ্রকে চিনিত না, একজন রূঢ়হস্তে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—'সাবধান! দূরে থাকো।'

সোমভদ্র ক্রোধ-দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—'আমি সেনানায়ক সোমভদ্র। তোমরা কে? একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

নাম শুনিয়া ভৃত্যেরা নরম হইল, বলিল, 'আমরা মহানায়ক অমোঘভল্ল মহাশয়ের ভৃত্য। মহানায়ক এই বন্দিনীকে নির্বাচন করেছেন। তাই ওকে তাঁর প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাচ্ছি।'

মেরুকা তখন দোলায় উঠিয়া বসিয়াছে, দারুগঠিত মূর্তির ন্যায় দেহ কঠিন করিয়া বসিয়া আছে। সোমভদ্র একবার তাহার পানে চাহিল, একবার ভৃত্যদের পানে চাহিল। তারপর দৃঢ় আদেশের সুরে বলিল,—'তোমরা দাঁড়াও, চলে যেও না। আমি মহানায়ক অমোঘভল্লের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র দ্রুত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যদ্বয় ফাঁপরে পড়িয়া কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করিল, তারপর দোলা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের কাছে প্রভুর আদেশই গরিষ্ঠ।

দোলার মধ্যে মেরুকা দারু-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিল। নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নাই, তাহাতে নিয়তি আরও নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। হয়তো এই বৃষস্কন্ধ প্রবীণ যোদ্ধার অন্তরে দয়া-মায়া আছে, হয়তো সে চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইবে, হয়তো—হয়তো—

দুর্বাঘাসের মত আশা মরিয়াও মরে না। বুদ্ধির দর্পণে অনিবার্য ভবিষ্যৎ দেখিয়াও মরিতে চায় না—

সোমভদ্র বন্দিনীদের আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল একটি বন্দিনীর বস্ত্র মোচন করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছেন। তিনি পাঁচটি বন্দিনী পাইবেন, এটি দ্বিতীয়। সোমভদ্রকে আসিতে দেখিয়া অমোঘভল্ল পরম সমাদরের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিলেন,—'দেখ তো সোমভদ্র, এই বন্দিনীটাকে বেশ শক্ত-সমর্থ মনে হচ্ছে। আমার বিহার-নৌকার দাঁড় টানতে পারবে?'

সোমভদ্র একবার বন্দিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিল, 'পারবে।' তারপর ব্যগ্রস্বরে কহিল, 'মহানায়ক, আপনার সঙ্গে আমার আড়ালে একটা কথা আছে।'

মহানায়ক অমোঘভল্ল ঈষৎ বিস্ময়ে একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'কি কথা?'

সোমভদ্র অধর লেহন করিয়া বলিল, 'মহানায়ক, যে-বন্দিনীকে আপনার ভৃত্যেরা নিয়ে যাচ্ছে, সে—সে—'

অমোঘভল্ল বলিলেন, 'যে বন্দিনীটার নাম মেরুকা তার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ মহানায়ক। মেরুকা—আমি—আমি তাকে নিতে চাই। তাকে—'

অমোঘভল্ল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'এখন আর হয় না বন্ধু। আমি তাকে হস্তগত করেছি। জানো তো, যে আগে আসে সে আগে পায়।'

সোমভদ্র বলিল, 'কিন্তু—আপনি আমাকে এই অনুগ্রহ করুন ভদ্র। আমি মেরুকাকে বিবাহ করতে চাই।'

অমোঘভল্লের হাস্যমুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন,

'বিবাহ! তুমি একটা বিদেশিনী বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও!'

সোমভদ্র অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ মহানায়ক, আমার হৃদয় মেরুকাকে চায়। আমি তাকে বিয়ে করে সংসার পাততে চাই।'

অমোঘভল্ল ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার গৃহে ভগিনী নাই?'

সোমভদ্র চক্ষু নত করিয়া বলিল, 'আছে ভদ্র'।

'যুবতী ভগিনী? বিবাহযোগ্যা?'

'হ্যাঁ ভদ্র।'

অমোঘভল্ল তখন গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন, 'ধিক সোমভদ্র। গৃহে বিবাহযোগ্যা যুবতী ভগিনী থাকতে তুমি একটা অজ্ঞাতকুলশীলা অজ্ঞাতচরিত্রা বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও! ওরা তো দু'দিনের সম্ভোগের সামগ্রী, ওরা কি ভগিনীর পদ অধিকার করার যোগ্য? তুমি সদ্বংশজাত, তুমি রাজ্যের একজন সেনানায়ক; তুমি যদি এমন কুদৃষ্টান্ত স্থাপন কর, তাহলে সামান্য লোকে কী করবে? জাতির সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবের বন্যায় ভেসে যাবে। তাছাড়া তুমিও সুখী হতে পারবে না। যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নেই, সে কি কখনও হৃদয়ের আত্মীয় হতে পারে? সে কি গৃহের গৃহিণী হতে পারে?'

কিন্তু উপদেশ বাক্যে সোমভদ্রের রুচি নাই। সে ত্বরান্বিত কণ্ঠে বলিল, 'মহানায়ক অনুগ্রহ করুন, মেরুকাকে দান করুন।'

অমোঘভল্ল দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'কখনই না। তুমি উন্মত্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়েছ; তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তোমারই সর্বনাশ হবে। যাও, গৃহে ফিরে যাও, আপন ভগিনীকে বিবাহ কর।'

সোমভদ্র কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার

অন্তর বিদ্রোহ করিতে চাহিল ; কিন্তু সে যোদ্ধা, আদেশ লঙ্ঘনে অনভ্যস্ত। সে টলিতে টলিতে ফিরিয়া চলিল।

অমোঘভল্ল সদয়কণ্ঠে তাহাকে ডাকিলেন, 'শোনো সোমভদ্র।'

সোমভদ্র আবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমোঘভল্ল সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, 'হতাশ হয়ো না। চুপি চুপি একটা কথা বলি শোনো। দু' মাস পরে হোক ছ' মাস পরে হোক মেরুকাকে আমি বিক্রি করব। তখন যদি তুমি ওকে চাও, তাহলে তোমার হাতেই ওকে বিক্রি করব, অন্য কাউকে দেব না। ইতিমধ্যে তুমি তোমার ভগিনীকে বিবাহ করে সংসারী হও। কেমন?'

সোমভদ্র আর সেখানে দাঁড়াইল না।

অদূরে শক্ত-সমর্থ বন্দিনীটা এতক্ষণ নগ্নদেহে অপেক্ষা করিতেছিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে ফিরিয়া গেলেন।

ওদিকে শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া শফরী শয্যায় পড়িয়া ছিল। সূর্যোদয় কালে সোমভদ্র যখন ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন সে দুঃস্বপ্নময় চিন্তার জাল সরাইয়া শয্যা হইতে উঠিল। ইতিমধ্যে পিতামাতাও জাগিয়াছেন। শফরী তাঁহাদের কাছে গিয়া সোমভদ্রের সঙ্কল্পের কথা জানাইল, তারপর সহসা মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতাপিতা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তারপর মাতা শফরীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই অসংবৃত হইয়া পড়িলেন। পিতার মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে

দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। সোমভদ্র বয়ঃপ্রাপ্ত এবং স্বাধীন, তাহাকে শাসন করা যায় না···বিজাতীয়া নারীকে বিবাহ করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে···এরূপ বিবাহ কখনো সুখের হয় না; মিশ্র রক্তের সন্তানসন্ততি কখনো ভাল হয় না, উন্মার্গগামী হয়··· এদিকে শফরীর কি হইবে···শ্যেনভদ্র নিতান্ত বালক; অগ্রজার সহিত অনুজের বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও বাঞ্ছনীয় নয়···বাহিরের পাত্র ঘরে ডাকিয়া আনিতে হইবে; ধাতুপ্রকৃতির বিষমতায় সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হইবে, খাল কাটিয়া কুমীর আনা এবং বাহিরের জামাতা ঘরে আ।। একই কথা···সোমভদ্র এ কী করিল! অন্ধ-মোহের বেশে সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল!

সকলের মনে বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, সকলের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। ওই বুঝি বধূর হাত ধরিয়া সোমভদ্র আসিতেছে! শফরী ভাবিতেছে, বধূকে দেখিয়া সে কী করিবে? সংযম হারাইবে না তো?

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, সোমভদ্র ফিরিল না। সকলের মন উৎকণ্ঠিত; শফরীর মনে ক্ষীণ আশা ঝিকমিক করিতে লাগিল—তবে কি ডাকিনীর মন্ত্রতন্ত্র ফলিয়াছে। তবে কি—?

দ্বিপ্রহরেও যখন সোমভদ্র ফিরিল না, তখন পিতা চিন্তিত মুখে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। মাতা শঙ্কা-ভরা বুকে রন্ধনশালায় গেলেন। শফরী অঙ্গনে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ তাহার বুক সন্ত্রাসে চমকিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতে সামভদ্রের অভ্যাস ছিল, যখনই কোনও কারণে তাহার মন খারাপ হইত, তখনই সে নদীর ধারে গিয়া বসিয়া থাকিত। একবার শফরীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল—বড় শান্ত শীতল ওই নদীর জল। যেদিন এ পৃথিবী আর ভাল লাগবে না, সেদিন ওর তলায় গিয়ে শুয়ে থাকব।

আতঙ্ক-শরবিদ্ধ হৃদয় লইয়া শফরী হরিণীর মত নদীতীরে ছুটিল।

জলের কিনারে একটি বালিয়াড়ির আড়ালে সোমভদ্র পাশ ফিরিয়া শয়ান রহিয়াছে, অলস হস্তে নুড়ি কুড়াইয়া একটি একটি করিয়া জলে ফেলিতেছে। শফরী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দেখিতে পাইল না। অন্তরের অতল গুহায় ডুবিয়া আছে।

শফরী মৃদু গদগদ স্বরে ডকিল, 'ভাই!'

সোমভদ্রের নিরুৎসুক চক্ষু শফরীর দিকে ফিরিল। শফরীর বুকের মাঝখানে কাটা দাগের উপর দৃষ্টি পড়িল। সে বলিল—'কি করে কেটে গেল?'

শফরী ভঙ্গুর হাসিয়া বলিল, 'কাটেনি। ঘুমের ঘোরে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলেছি। চল, বাড়ী চল।'

সোমভদ্রের চোখে একটু সচেতনতা দেখা দিল, সে বলিল—'বাড়ী? কেন?'

'সারাদিন খাওনি। এস।' শফরী সোমভদ্রকে কোনও প্রশ্ন করিল না, শুধু হাত বাড়াইয়া দিল। সোমভদ্র হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কোনও কথা না বলিয়া শফরীর পাশে পাশে বাড়ীর দিকে চলিল।

কয়েক মাস পরে একদিন অপরাহ্ণে শফরী অঙ্গনের দ্বারের কাছে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। প্রাতঃকালে সোমভদ্র কয়েকজন বন্ধুর সহিত নদীর পরপারে মৃগয়ায় গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

দূরে সোমভদ্রকে আসিতে দেখা গেল। তাহার স্কন্ধে ধনু, পৃষ্ঠে মৃত হরিণ-শিশু, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। শফরী হর্ষসূচক শব্দ করিয়া তীরের মত তাহার দিকে ছুটিল। পিতামাতা অঙ্গনের বেদিকার

উপর বসিয়াছিলেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সোমভদ্র আসিতেছে।

শফরীকে আসিতে দেখিয়া সোমভদ্র দাঁড়াইল; ধনু ও হরিণ মাটিতে নামাইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। শফরী নীড়-প্রত্যাশী পাখির মত তাহার বাহুবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বহুদিন পরে সে সোমভদ্রের মুখে সেই পুরাতন অকুণ্ঠ হাসি দেখিয়াছে। এতদিন পরে বিদেশিনী কুহকিনীর মোহজাল ছিঁড়িয়া সোমভদ্র তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়া

শফরী মুখ তুলিয়া ক্ষুধিত চক্ষে সোমভদ্রের পানে চাহিল। সোমভদ্র তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিল। শফরী দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, 'বলো ভগিনী—বলো বহিন—বলো বোন।'

সোমভদ্র বলিল, 'ভগিনী—বহিন—বোন।'

অতঃপর মন শান্ত হইলে শফরী ধনু ও হরিণ তুলিয়া লইল। দুজনে গৃহে প্রবেশ করিল।

সোমভদ্র পিতার সম্মুখে গিয়া সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিল,—'বাবা, আমাদের বিয়ে দেবে কবে

পিতা সচকিতে পুত্র ও কন্যার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর কোমল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'এখনি পুরোহিতের কাছে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র ও শফরী গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। পিতামাতা পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিলেন। মাতার চক্ষু আনন্দে বাষ্পাচ্ছন্ন হইল।

তাঁহারাও ভ্রাতা-ভগিনী।

এইবার কাহিনীর স্থান কাল বলা যাইতে পারে। ঘটনাস্থল প্রাচীন মিশর ; ঘটনাকাল আজ হইতে অনুমান পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে। মিশরবাসীরা তখন চক্রযানের ব্যবহার জানিত না, লৌহ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, অশ্বের সহিত মনুষ্য জাতির পরিচয় ছিল না। যে মানুষগুলির কাহিনী লিখিলাম, তাহারা কিন্তু আমাদের মতই মানুষ ছিল।